Vol. 51 | No. 1 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শামসুর রাহমানের উপন্যাস : কবিস্বভাব ও কাব্যিকতা

Volume	51
Issue	1
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জাহিদ হাসান সরকার
Published online	October 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v51i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i1.8
Pages	১৪৩-১৭৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫১, সংখ্যা : ১ ॥ কার্তিক ১৪২০ ॥ অক্টোবর ২০১৩

শামসুর রাহমানের উপন্যাস : কবিস্বভাব ও কাব্যিকতা

Check for updates

জাহিদ হাসান সরকার*

শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) কবি-পরিচয় অবিসংবাদিত; রয়েছে তাঁর বাংলাদেশের 'প্রধান কবি'-র স্বীকৃতিও। কিন্তু দূর সমুদ্রে জেগে ওঠা নির্জন দ্বীপের মতো চারটি উপন্যাস — *নিয়ত মন্তাজ* (১৯৮৫), *অদ্ভুত আঁধার এক* (১৯৮৫), *অক্টোপাস* (১৯৮৩), *এলো সে অবেলায়* (১৯৯৬) — তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয়টিকেও দ্যোতিত করে। কবিতা রচনার মধ্য প্রহরে একজন কবি যখন গদ্যের শরীরে জীবন ফুটিয়ে তোলায় প্রয়াসী হন, তখন কবিত্ব গদ্য-ভুবনে আশ্রয় খুঁজবে এটিই স্বাভাবিক। একই কবিমানস থেকে কবিতা ও উপন্যাসের উৎসারণ হেতু কবির উপন্যাসে 'কবিসুলভ সংবেদনশীলতা, কবিতার ব্যঞ্জনাশক্তি, আত্মগত ভাববাদ, বিশেষ করে আত্মজৈবনিকতা' (বেগম আকতার, ২০০৭ : প্রসঙ্গ-কথা) প্রতিফলিত হওয়াই সংগত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসে বিশেষত প্রকরণ পরিচর্যায় কবিত্ব সংক্রমিত; জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস তো তাঁর কবিতারই গদ্যভাষ্য, যদিও সে গদ্যও আবার কবিতালিপ্ত। শামসুর রাহমানের উপন্যাসসমূহে কবিতার মৌলধর্ম প্রবিষ্ট কি না, অথবা বিষয় ও বিষয়ীতে তাঁর কবি-প্রতিভার ছাপ কীভাবে পড়েছে তারই অনুসন্ধান বর্তমান প্রয়াস। অবশ্য উপন্যাস আলোচনার ফাঁক-ফোকরে শামসুর রাহমানের কবি-মনোভূমি ও কবিতা-বিশ্বে তাঁর পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিপ্রক্ষেপ ও বিবেচনার প্রয়োজন হবে আমাদের। বর্তমান নিবন্ধে উপন্যাসগুলো অনুপুঙ্খ পাঠের ভিত্তিতে আলোচিত হলেও রাহমানের কবিসত্তার আলোচনায় পূর্বজ ধারণার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

এক

আলোচনার সুবিধার্থে সাহিত্যের প্রকরণ হিসেবে কবিতা ও উপন্যাসের রূপ ও স্বভাবগত মিল-অমিলের পরিচয়টুকু শুরুতেই সংক্ষেপে জেনে নেওয়া আবশ্যক। কবিতা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা আত্মতালিপ্ত প্রকরণ। দেশ-কাল-সমাজ-প্রকৃতি সরাসরি কবিতার ভূগোল রচনা করে না; কবি-মনোভূমিই কবিতার স্বদেশ। দেশ-কাল-সমাজ-প্রকৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের শেকড় বেয়ে কবির সূক্ষ্ম অনুভূতিময় গভীর চৈতন্যে সৃষ্টি করে এক নতুন ভুবন; আর এই ভুবনের ছান্দস প্রকাশই কবিতা। কবিতায় যে জীবনকে আমরা পাই সেটি আমাদের দৃশ্যমান বাস্তব জীবন নয়, বকযন্ত্রের ভেতর দিয়ে স্পন্দিত হওয়া ভিন্নতর নিভৃত জীবন। এই জীবনের অধিষ্ঠান বাস্তবের মৃত্তিকায় নয়; মনের ভেলায় ভেসে বেড়ানো মেঘলোকে, এক অপার রহস্যঘন সৌন্দর্যময় অনুভূতির দেশে। এই জন্যই কবিতার জীবন আধো চেনা, আধো অচেনার ধোঁয়াশায় মোড়ানো। যথার্থ কবিতায় সাধারণত কোনো কাহিনি থাকে না, ঘটনার সমাবেশ থাকে না; থাকে কবির চৈতন্যমথিত সূক্ষ্ম অনুভূতিমালার প্রক্ষেপণ। চেতনাসমেত কবিই কবিতা, কবিতার সর্বাঙ্গে মুক্তোর দানার মতো মিশে থাকে কবির কল্পনাপ্রতিভা।

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নরসিংদী সরকারি কলেজ।

অন্যপক্ষে মৃত্তিকালগ্ন জীবন, সুখ-দুঃখ-হাসি-আনন্দে মাখামাখি প্রত্যক্ষ জীবন, দেশ-কাল-সমাজমথিত স্পর্শযোগ্য বাস্তব জীবন উপন্যাসের ধ্যেয়। উপন্যাস যুগশিল্প; কালের গদ্যময় প্রতিমা —'গদ্যে বর্ণিত কল্পিত আখ্যানের মাধ্যমে জীবন ব্যাখ্যা'। (সরোজ, ১৯৭৬ : ৩) তীব্র জীবন-পিপাসার তৃপ্তিসাধনই উপন্যাসের গোড়ার কথা এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাই এর সাফল্যের প্রধানতম মানদণ্ড। উপন্যাসে জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক বোধ সঞ্চারের জন্যই ঔপন্যাসিকের সমুদয় আয়োজন। উপন্যাসে কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র-পাত্র, এমনকি ভাষাবিন্যাস—এই সবকিছুর সমাবেশ ঘটে জীবনকে জীবনার্থময়তায় উপস্থাপনের প্রয়োজনে। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কখনো দ্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ; তিনি জীবনকে যেখানে যেমন দেখেন, মুক্ত দৃষ্টিতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তেমন করেই উপস্থাপন করেন আর তাতে অন্তঃশীল থাকে তাঁর অভিজ্ঞতা ও মতাদর্শ। প্রকরণ হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশের যুগে জীবন উপস্থাপনে নির্মোহতাই ছিল উপন্যাসের প্রধানতম, অথবা বলা যায়, একমাত্র অঙ্গীকার। পরবর্তীকালে অবশ্য যুগধর্মের পরিবর্তনের অনুষঙ্গে প্যাটার্ন বদলে যাওয়া জীবনের রূপায়ণে উপন্যাসকেও কাঠামোসমেত বদলাতে হয়েছে। জীবন-রূপায়ণের অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় কোথাও নাটকীয় দৃশ্য পরিকল্পনায়, কোথাও কবিত্বময় বর্ণনার সুমিত পরিচর্যায় উপন্যাসের জটিল জঙ্গম অবয়ব নির্মিত হতে থাকে।

উপন্যাসের পটভূমি নির্মাণ করে দেশ-কাল-সমাজ-পরিপার্শ্ব। সমাজ-অন্তর্গত মানুষের বিচিত্র প্রান্ত সজীব হয়ে ওঠে উপন্যাসের কাহিনি-কাঠামো ও ঘটনাপ্রবাহে। পাঠক উপন্যাসের চরিত্র-পাত্রের সঙ্গে অনুভব করে নিবিড় অন্তরঙ্গতা; নিজেকে খোঁজে সে ওইসব চরিত্রের মধ্যে। কিন্তু একজন আধুনিক কবি যিনি আপাদমস্তক কবিতা-সংসক্ত, কবিতায় অবিরাম ফুটিয়ে তোলেন অন্তর্লীন অনুভূতিমালা, তাঁর রচিত উপন্যাসে কবিতা ও কবি-মানস প্রভাব ফেলবে এটাই স্বাভাবিক। কবির উপন্যাসের পটভূমি তৈরি করে কেবল দেশ-কাল-পরিপার্শ্ব নয়; কবিসত্তার মনো-ভূগোলও হয়ে ওঠে উপন্যাস সৃজনের অনিবার্য প্রেরণা। বহির্জগতের তুচ্ছ পদপাতও কবির সূক্ষ্ম চৈতন্যে যে তরঙ্গমালা সৃষ্টি করে তা উপন্যাস-অবয়বে পরস্পরিত হয়ে কোনো কাহিনি গড়ে না, তৈরি করে ব্যঞ্জনাবাহী প্রতিমা বা চিত্রকল্পগুচ্ছ।

দুই

প্রথম বিশ্বসমরোত্তর অসুন্দর-দীর্ণ, অন্ধকার-আচ্ছন্ন পরিপার্শ্ব-পৃথিবীকে মোকাবিলা করতে গিয়ে তিরিশি কবিরা চৈতন্য ও মননাশ্রয়ী প্রতীকী জগতে আশ্রয় নেন এবং তাঁদের কবিতার বড়ো অংশই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত শস্য। ঐতিহাসিক কারণেই বিভাগোত্তর বাংলাদেশের কবিতা রৌদ্রজ্বলা বহির্জীবনময় আর শামসুর রাহমান অবিসংবাদিতভাবে এ কবিতার প্রধান পুরুষ। সর্বাধিক তিরিশলগ্ন হয়েও শামসুর রাহমান আপাদশির ধরা দিয়েছেন অসুন্দর, জ্বালাময় সমকালতাড়িত জীবন ও বস্তু-পৃথিবীর বন্ধনে। 'স্বপ্নরঞ্জিত মনোবিশ্বের মোহ এবং স্বপ্নশূন্য প্রতিবেশ-পৃথিবীতে প্রবেশাকাঙ্ক্ষা শামসুর রাহমানের দুই প্রধান প্রবণতা : প্রথমটি তাঁকে টেনে নেয় মনোলোক-স্বপ্নলোকে: আর দ্বিতীয়টি তাঁর সামনে মেলে দেয় বস্তুলোকের রাস্তা।' (হুমায়ুন, ১৯৯৬ : ৪১) কখনো তিনি কবিতায় ছড়িয়েছেন বিজনতা, নৈঃসঙ্গ্য, বিষাদ আর

স্বপ্ন-সৌন্দর্যস্পৃহার মনোজকণা; আবার কখনো অন্তরঙ্গ মনোবিশ্ব ছেড়ে তুমুল হেঁটে চলে গেছেন সৌন্দর্যরহিত, নরকপ্রতিম সমকাল-বিশ্বে। 'তাঁর দুটি আত্মা - একটি নিমগ্ন ও স্বস্থিত, অন্যটি বহির্মুখী, বাহ্যজগতের দিকে বাড়ানো এন্টেনা। ঐ এন্টেনায় ধরা পড়ে কোলাহল, মানুষের চিৎকার ও আর্তনাদ, কষ্টের কলাপ ও জিঘাংসার জয়ধ্বনি। ফলত, প্রায়শ, কবিকে পালাতে হয় নিজের কাছ থেকেই, এবং নিজের দিকেই। দুই আত্মার সমীকরণ সম্ভব হলে কবির জীবনযাপন হতো সমঞ্জস ও সুখী। কিন্তু তা কখনো ঘটে না। দুটি অভিযাত্রা, 'the two voyages', দুদিকে টানতে থাকে। ...তিনি একসময় ছেড়ে যাবেন আত্মপরতার মোহন বাগান; তাঁর সৌন্দর্য পিপাসু ঈসথেট আত্মা ক্রমাগত জায়গা ছেড়ে দেবে বহির্পৃথিবী-অভিমুখ আত্মাটির কাছে। ক্রমাগত তিনি হবেন লোকালয়ের, কোলাহলের; সংবৃতি থেকে তিনি উঠে আসবেন বিবৃতির ডাঙায়। তখন ঐ রূপালী স্নানের কুয়াশাময়তা যাবে সরে; তিনি নৈঃসঙ্গ্যের সম্পন্নতা ছেড়ে মানুষের দঙ্গলে মিশে যাবেন।' (খোন্দকার, ১৯৯৪ : ৪৮) প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*-র সর্বত্র লেপ্টে রয়েছে আত্মমগ্ন, নির্জন-বিষণ্ন-মেদুর, কল্পনারঙিন ও সৌন্দর্যলিপ্ত মনোভুবন। তবে সমকাল কখনো কখনো বিদ্যুচ্চমকের মতো নিনাদসহ তছনছ করেছে কবির অন্তর্ভুবন। এরপর দ্বিতীয় কাব্য *রৌদ্র করোটিতে* গ্রন্থে শামসুর রাহমান বিষাদখচিত মনোবিশ্ব থেকে উঠে আসেন রৌদ্রদগ্ধ, ঝাঁঝালো, ক্লান্তিকর, স্বপ্নসৌন্দর্যশূন্য নারকীয় পৃথিবীতে; কবির স্বপ্ন-সৌন্দর্য-কল্পনাময় নীলিমার গায়ে লাগে উত্তাল সমকালের গাঢ় কালিমা। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ *বিধ্বস্ত নীলিমা*-য় তাঁর মনো-নীলিমা বস্তু-বাস্তবের তীব্র আক্রমণে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহে সমকাললিপ্ত জীবনের এই ঝাঁজ হয়েছে তীব্র থেকে তীব্রতর। নিজের নিঃসঙ্গতার গৃহকোণ থেকে তিনি ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছেন গণমানুষের মধ্যে। একাত্ম হয়েছেন তাদের দুঃখ-বেদনা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। একটি নতুন জাতির উন্মেষপর্বে তিনি যেন জাতির হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনকে ভাষা দিয়েছেন। একজন নিভৃতচারী কবির এই প্রকাশ্য ভূমিকায় উত্তরণ তাঁর জন্য সৃষ্টি করেছে এক অনন্য সম্মানের আসন।

অতিমাত্রায় সমকাল-সংলিপ্ততার কারণে শামসুর রাহমানের কোনো কোনো কবিতা বর্ণনার প্রাচুর্যে হয়ে ওঠে উপন্যাসের মতো ব্যাপক; তার প্রিয় আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দ পায় গদ্যপদ্যের সামবায়িক দ্যোতনা। *রৌদ্র করোটিতে* কাব্যগ্রন্থভুক্ত ছিয়াশি পঙ্‌ক্তির "খেলনার দোকানের সামনে ভিখিরি" শিরোনামের কবিতাটি পদ্যোপন্যাসের এক প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। কবিতাটির সর্বাঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে অন্ধকার সময়-পরিপার্শ্ব; জীবনের দুর্দান্ত গদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে অজর স্বপ্ন; কবিতাটির পরিণাম সঞ্চারিত হয়েছে শোচনীয় উদ্দেশ্যহীনতায়। কবিতার "প্রান্তজন 'পথের গোলাম', তার বর্ণিল স্বগতোক্তিতে কড়িহীনতা ও সৌন্দর্যপিপাসা, খেলনার পণ্যমূল্য এবং শিল্প তথা আনন্দমূল্যের অসঙ্গতি ও বিড়ম্বনা এবং তার ফলে নিজের লাঞ্ছনার কথা বলে। আত্মার আরামের জন্য খেলনার দোকানের কাচে চোখ-মুখ ঘষতে বড়ো সাধ হয় তার, কিন্তু ক্রুদ্ধ দোকানি খেঁকিয়ে উঠে আঁস্তাকুড়ে আস্তানা নিতে বলে। সে মেনে নেয় 'খেলনা ফেলনা নয়'। কিন্তু এই বহুদর্শী চারণ-দার্শনিক, যে প্রত্যক্ষ করেছে উদ্ধত ক্ষমতাধরদের হাতে নতুন সৃষ্টির তরুণ কারিগরদের নিগ্রহ, মানুষের আলোর চেয়ে অন্ধকারে বেশি মনোযোগ,

এবং গোলাপ-কলিজা ছেঁড়া, সে 'খেলনা ফেলনা নয়' কথাটি ক্রূর বিদ্রূপে 'ভদ্দর পাড়ার' 'ভালুক' ব্যান্ডের বাজনার সুরে মিশিয়ে দেয়। অন্যদিকে চৈত্ররাতে ফুটপাতে শুয়ে থাকা এ ভিখিরির 'ঠ্যাং দুটি একতারা/হয়ে বাজে তারাপুঞ্জে, মর্মরিত স্বপ্নের মহলে'।" (ভূঁইয়া, ২০০৬ : ৫০) কবিতার মতোই রাহমানের উপন্যাসে সুগঠিত ও সুবলয়িত কাহিনি-কাঠামো অনুপস্থিত; আধুনিক মানুষের মীমাংসাহীন জীবন-পরিণামের স্মারক হয়ে ওঠে পরিণামশূন্য সমাপ্তি। চরিত্রের কোনো পূর্ণাঙ্গ আদল খুঁজে পাওয়া যায় না; তাদের বিভঙ্গ, শতচূর্ণ অস্তিত্বের গুঁড়ো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে উপন্যাসের শরীর জুড়ে; তাদের বহির্জীবন নিস্তরঙ্গ, নিরুত্তাপ; কিন্তু বহির্জীবনের সামান্যতম তরঙ্গও মনের গহীন তলে তোলে সত্তা-নাড়ানো প্রবল বিলোড়ন; সমকাল প্রতিবেশে তারা পদস্খলিত, গ্রস্ত প্রতারক চোরাবালিতে; কিন্তু মনোলোক অপার্থিব রোমান্টিক স্বপ্ন-সৌন্দর্যে রাঙানো; বিরূপ বিশ্বে আত্মসংরক্ষণ এবং মায়াবি, স্বপ্নময় মনোবিশ্ব বাঁচানোই তাদের বড়ো সমস্যা।

শামসুর রাহমানের কবিতা সারাক্ষণ 'আমি'-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত; ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, যৌনতা, গোপন-নিষিদ্ধ ভাবনা তাঁর কবিতায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। 'ভ্যানগঁগ যেমন বিভিন্ন বর্ণে শেডে ও পরিচর্যায় সৃজন করে গেছেন একটির পর একটি অদ্ভুত আত্মপ্রতিকৃতি..., শামসুর রাহমানও তেমনি তাঁর বিশাল কবিতা-সাম্রাজ্যে একের-পর-এক কবির অস্তিত্ব সৃজন করেছেন। একটুকু অভিনিবেশ নিয়োগ করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় ওইসব কবির আদল বা গড়ন প্রায় অভিন্ন; স্বভাবে, প্রেরণায় এবং প্রাত্যহিকতায় তাঁরা শামসুর রাহমানেরই দোসর।' (ভীষ্মদেব, ২০১০ : ১৪৪) কবিতার মতোই উপন্যাসেও তিনি আত্মপ্রতিকৃতি রচনায় সমান উদ্দীপ্ত। তাঁর উপন্যাস চতুষ্টয় গড়ে উঠেছে সেইসব নায়ককে কেন্দ্র করে, যেসব নায়ক প্রত্যেকেই নিঃসঙ্গ, বিজন, সৌন্দর্যধ্যানী ও আত্মতালিপ্ত; সর্বোপরি শিল্পমগ্ন অথবা শিল্পলগ্ন। তাঁর উপন্যাসের নায়কেরা কেউ প্রথিতযশা কবি; কেউ শিল্প-চেতন ঔপন্যাসিক; কেউ সাংবাদিক, কিন্তু শিল্পীর পরম সম্পদ কল্পনা-ধনে ঋদ্ধ; আবার যিনি অধ্যাপক, তিনিও সাহিত্য-ঘনিষ্ঠ, কবিতার বোদ্ধা পাঠক। নায়কের সাপেক্ষে নায়ক-লগ্ন হয়ে অথবা নায়ক চরিত্রের পূর্ণতা ও পরিণাম সঞ্চারের অনুষঙ্গে উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্র-পাত্র ও ঘটনা-প্রবাহের আয়োজন সম্পন্ন হয়। এই নায়কদের অনুভবের জগতে কান পাতলে মর্মরিত হয়ে ওঠে নিকট অথবা দূরাগত একেক জন শামসুর রাহমান —এ মন্তব্যের সমর্থন জোগাবে কবির আত্মজীবনী *কালের ধুলোয় লেখা* গ্রন্থের কোনো কোনো পৃষ্ঠার সমান্তরাল পাঠ।

তিন

নিয়ত মন্তাজ চলচ্চিত্র জগতের পটভূমিতে ও টেকনিক অবলম্বনে রচিত এক মনোজটিল উপন্যাস। আলোচনার সুবিধার্থে উপন্যাসটি বিশ্লেষণের শুরুতেই চলচ্চিত্রের মন্তাজ-তত্ত্বটির স্বরূপ জেনে নেওয়া প্রয়োজন। সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক আইজেনস্টাইন 'মন্তাজ' তত্ত্বের প্রবর্তক। 'পরস্পর সম্পর্করহিত দুটি জগতের সংঘর্ষ বা দ্বান্দ্বিক অগ্রগতি' (সুধীর, ২০০৫ : ৩৬৭) তাঁকে মন্তাজ তত্ত্ব নির্মাণে অনুপ্রাণিত করে। 'মন্তাজ' আইজেনস্টাইনের সমন্বয়ী ও গতির শিল্পতত্ত্ব, যেখানে মানব-মনীষার সকল শাখার

আবাহন আছে। বিজ্ঞান ও শিল্পের মিথস্ক্রিয়ার মহৎ রূপ নির্মাণে তিনি আগ্রহী ছিলেন। শিল্পকে তিনি যান্ত্রিক স্তর থেকে ইনটেলেকচুয়াল বা বুদ্ধিগত স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছেন। আইজেনস্টাইন বাস্তবের যথাযথ প্রতিফলনকেই শিল্প ভাবেননি। তাঁর শট–মন্তাজের গুণগত লাফে বাস্তব পাল্টে যায়, নতুন অর্থময়তা অর্জন করে। 'বাস্তবের উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে, আবার তাদের সমন্বিত করে, neutralization-এর মধ্য দিয়ে তিনি চূড়ান্ত নির্মিতি করেন।' (পার্থপ্রতিম, ১৯৯২ : ২৭) রেনেসাঁসে যে ব্যক্তির মুক্তি ও জাগরণ ঘটেছিল, পুঁজিনির্ভর বুর্জোয়া সভ্যতার আগ্রাসনে অচিরেই সেই ব্যক্তিই বিচ্ছিন্নতায় নিপতিত হয়। বিশ্লেষকের ভাষায় :

> মার্কসীয় বীক্ষায় এই ইনডিভিজুয়ল, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই পার্সন হয়ে উঠতে চায় : পরিবেশ-মানুষ-প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগে এক ঐকতানে বাজতে চায়। আইজেনস্টাইনও এই ব্যক্তিকেই তাঁর শিল্পচিন্তায় রাখেন : মুখের টাইপেজের স্থিরতা, মন্তাজের গতিতে অর্জন করে সেই ব্যক্তিত্ব যা নিজস্ব অভিজ্ঞানচিহ্নিত, আবার বৃহত্তরের সঙ্গে যুক্ত।...আসলে দ্বান্দ্বিক গতির বা প্রগতির যে ধারণা তিনি মার্কসীয় বীক্ষা থেকে পান, থিসিস-এন্টি-থিসিস-সিনথেসিসের যে তাত্ত্বিক দৃষ্টি অর্জন করেন, তার থেকে মন্তাজের গুণগত সমন্বয়টি আসে।...নানা ধরনের মন্তাজের কথা তিনি বলেছেন। মন্তাজের মধ্য দিয়েই তিনি কাট নির্ভরতাকে ত্যাগ করেন। একটি শট নয়, শটের সংঘাত গতি অর্থাৎ নির্মাণটাই বড় কথা। এর সমর্থন তিনি পান প্রাচ্য সংস্কৃতিতে : দুটি ধারণা বা আকর্ষণের সংঘাত এখানে বড় কথা। পাখি ও তার মুখের ছবির অর্থ "গান করা", শিশু ও তার মুখের ছবির অর্থ "তীক্ষ্ণ আওয়াজ"। পাখি থেকে শিশুর আকর্ষণের পরিবর্তন একই ধারণার নাম রূপের সৃষ্টি করে শুধু তাই নয়, নতুন-এরও সৃষ্টি করে।...আসলে মন্তাজ একটি ভাষা, যে ভাষায় আংশিক অনুপুঙ্খ একটি সমগ্রে গ্রথিত হয়। আর গ্রথিত হওয়ার সূত্রেই, সামান্যকৃত ইমেজে স্রষ্টা, দর্শককে অনুসরণ করেই থিমটিকে অভিজ্ঞতায় আনেন। আইজেনস্টাইনের শিল্পতত্ত্বের আলোচনায় ডাডলে অ্যান্ড্রু "ফিল্ম সেন্স" থেকে এই উদ্ধৃতিটি দেন : A work of art, understood dynamically, is just this process of arranging images in the feelings and mind of the spectator. ... একটি ইমেজ দিয়ে শুরু করে, তাকে সর্বোত্তম উপায়ে দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত করার উপায় হিসাবে মন্তাজকে দেখেছেন। এই ইমেজ স্থির-নির্দিষ্ট কিছু নয়, এর জন্ম হয়, এর উদ্ভব হয়।... শিল্পকে তিনি বহির্জগৎ-বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি, অন্যদিকে বহির্জগতের যথাযথ প্রতিফলও ভাবেননি।...বিশ শতকের প্রথমে, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই, বুর্জোয়া শিল্পে ও শিল্পতত্ত্বে যে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির চর্চা প্রবলভাবে চলছিল, তার প্রতিপক্ষেই আইজেনস্টাইন এমন এক শিল্পতত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন যাতে শিল্প-শিল্পী ও শিল্প গ্রহীতা এক দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ে মেলবার সুযোগ পায়। বিষয় ও বিষয়ী একই আবেগ ও অনুভূতিতে বেজে ওঠে। আইজেনস্টাইনের শিল্পতত্ত্ব একই সঙ্গে বিশুদ্ধ শিল্পের অন্বেষণ, আবার তার বৃহত্তর উদ্দেশ্য, প্রাসঙ্গিকতার সন্ধান। চৈতন্য ও বস্তুর দ্বান্দ্বিক-মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কের এ এক তাত্ত্বিক প্রস্থান যার শিল্পরূপ তিনি নিজেই রচনা করেছেন মহৎ চলচ্চিত্রের চিত্রকল্পে। (পার্থপ্রতিম, ১৯৯২ : ২৮-৩০)

এ প্রসঙ্গে শামসুর রাহমানের কবিতা বিবেচিত হতে পারে। আমরা জানি, তাঁর কবিতার একটি বড়ো অংশ বিসংগতিপূর্ণ; এবং এ বিসংগতি সর্বাধিক দৃশ্যমান পারম্পর্যরহিত চিত্রকল্পে। ওই বিসংগতি শির তোলে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ থেকেই :

অন্ধ ও বধির
ঘোড়াগুলি নক্ষত্র বমন করে, লেজের দাপটে
তাড়িয়ে বেড়ায় খোজা ক্রীতদাস, নগ্ন ক্রীতদাসী।
['বন্ধুদের প্রতি' : *বিধ্বস্ত নীলিমা*]

উদ্ভট, বিসংগত শব্দচিত্রের মাধ্যমে কবি আমাদের চেতনায় ঘা দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক নবজাত উপলব্ধিতে উন্নীত হন। উন্মত্ত ও চেতনাবিপন্নকারী চিত্রকল্পের শতমুখী বুননে চেতনার অন্তস্তলে শায়িত দ্বৈত কবিসত্তার উন্মোচন করেন অবিরাম। এ ক্ষেত্রে কবির এক অফুরান প্রেরণা চলচ্চিত্রের 'মন্তাজ' তত্ত্ব :

এই তো হরিণ ছোটে, রত্নরাজি ওড়ায় সুতীক্ষ্ণ খুরে, ফুলের মেঘের
নরম সংকেতে জেগে ওঠে, মঞ্জুরিত গুপ্ত ক্ষেত।
আবেগের গলায় পা রেখে দেখেছি তো, তবু জ্বলজ্যান্ত স্বর
সোনালি ঘণ্টার মতো বাজে চতুর্দিকে আর ঘর
বাড়ি উল্টোপাল্টা ছুটে যেতে চায় আকাশের সুনীল মহলে।
['মন্তাজ': *আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি*]

কবিতার সঙ্গে জীবনের গূঢ় ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কতদূর যেতে পারে তারই এক বিস্ময়কর দলিল শামসুর রাহমানের সারাজীবনের কবিতা। কবিতায় তিনি উন্মোচন করেছেন নিজেকে, সম্পূর্ণভাবে, এক অসাধারণ অকপট স্বচ্ছতায়। (দ্র. ভূঁইয়া, ২০০৬ : ৪৫) 'বাংলার সজল মাটিতে প্রোথিত-শেকড় কবি শামসুর রাহমান এক বিশ্ববিহারী চৈতন্য। এ চৈতন্যের নানা স্তর, বিস্তৃত তার পরিধি, ব্যাপক পাঠে তা সিঞ্চিত, বিচিত্র ক্ষেত্রে তার বিচরণ। এ চৈতন্যের বাহন তাঁর ভাষা, এ আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন ভাষায় উপস্থিত অগণন গ্রাম,কতিপয় শহর আর একটি রাজধানী, যার ছবি কথা ও ধ্বনি মিশে গড়ে পুরো বাংলার স্বভাব।' (ভূঁইয়া, ২০০৬ : ৪৭) আর নিজের ব্যক্তিগত পুরাণের সঙ্গে প্রতিভাসিত হয় কবি ও কবিতা, বিপন্ন স্বদেশ-সমাজ, সুন্দর-বাস্তব-কল্পনা এবং সময়-মৃত্যু-ঈশ্বর।

নিয়ত মন্তাজ উপন্যাসের নায়ক নাসিম তারেক কবি শামসুর রাহমানের মতোই দুই মহলের বাসিন্দা—অন্তর্মহল ও বহির্মহলে তার বিচরণশীলতা। বাস্তবের উত্তপ্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই তার বহির্মহল-নিবাস। এখানে সে অতি সাধারণ ছা-পোষা মানুষ, সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র পত্রিকা 'অলকানন্দা'-র সামান্য বেতনভোগী রিপোর্টার; তবে সে চলচ্চিত্র-বোদ্ধা, চলচ্চিত্রের সমস্যা তাকে আলোড়িত করে, ফিচার লিখে সে সমস্যা-উত্তরণের রূপরেখা তৈরি করে, চলচ্চিত্রের স্ক্রিন প্লে রচনার শিল্প-সম্ভাবনা তার সত্তার গভীরে নিহিত। স্ত্রী নাহিদ ও তিন বছর বয়সী এক কন্যা-সন্তান নিয়ে তার চার বছরের দারিদ্র্য-লিপ্ত ঘানিটানা সংসার। তার বসবাস ময়লা ঘিঞ্জি গলির ভেতরে খাট্টা ড্রেনের পাশে পায়রার খোপের মতো ঘরে, যার জন্য মাসে সাত শত টাকা ভাড়া গুণে সে হাঁপিয়ে ওঠে। সহকর্মীকে বিশ টাকা ধার দিলেই তার মাসিক খরচে শুরু হয় টানাপড়েন। কাজের মেয়ে বসিরনকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও থাকতে দিতে হয় আবাসঅযোগ্য এঁদো রান্নাঘরে। এই অভাব-তাড়িত, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত, অনুজ্জ্বল, নিরুৎসব জীবন তার সমগ্র সত্তায় ছড়িয়ে দেয় গ্লানির বিষ। দারিদ্র্যের হাড় বের-করা ভ্যাংচানো রূপকে অস্বীকার করে তার ভগ্ন-বিধ্বস্ত মন আশ্রয় নেয়

মোহন কল্পনায়; অবারিত কল্পনার তন্তুজালে বুনন করে দুর্বহ বাস্তব জীবনের সমান্তরাল আরেক জগৎ—অন্তর্মহল—অপার মহিমাময় সৌন্দর্যলোক।

নাসিম তারেক অন্তর্মুখী ও কল্পনাপ্রবণ; বাস্তবে ভীতু, সংগ্রাম-বিমুখ, পলায়নপর, আত্মবিবরে প্রবিষ্ট নিভৃতি-বিলাসী মানুষ। জনসঙ্ঘে সে অস্বস্থ; কিন্তু কল্পনায় নিজেকে দেখে বাস্তবের বিপরীত অক্ষে—heroic image-এ। কল্পনাগুলো একেবারেই নিরীহ ও নিষ্কলুষ; এগুলো ব্যক্তিগত এবং নিজেকে অতি সাধারণ থেকে অসাধারণ করে তোলার ভাবনা-কেন্দ্রিক। কঠোর বাস্তবতা যার সত্তায় বয়ে আনে ভীতি-বিহ্বল, হিম-শীতল মৃত্যুর অনুভূতি; কল্পনার রঙিন ভুবনে সে-ই হয়ে ওঠে আত্মপ্রত্যয়ী, অসংকোচ, দীপ্তিময় ও প্রবল-প্রমত্ত পুরুষ। বাস্তবে পরাভূত, কিন্তু কল্পনায় পরিপার্শ্বের সবাইকে ছাপিয়ে, ম্লান ও নিষ্প্রভ করে দিয়ে সে পরিণত হয় মহামহিম নায়কে—কখনো সঙ্গীতে, কখনো খেলার ময়দানে বা অন্যত্র। বাস্তবের জনতা-বিমুখ ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষটি কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে হয়ে উঠতে চায় জনতার মধ্যমণি। এভাবেই সে ব্যক্তিগত জীবনের অপ্রাপ্তির ফাঁকগুলো পূরণ করে নেয়। ছায়ানটের অনুষ্ঠানে নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে উদ্যোক্তাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা কল্পনা করে সেখানে সে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে তার প্রবল বিশ্বাসপূর্ণ কল্পিত আত্মপ্রকাশ ধরা পড়েছে কবিত্বময় উপমা-চিত্রকল্পে : 'নাসিম তারেক বসে আছে ধ্যানী সন্তের মতো, যেন একটি অকম্পিত শিখা; বর্ষারাতে জ্বলছে একা।' (শামসুর, ২০০৭ : ১১) গুপ্ত প্রতিভার কাল্পনিক প্রকাশে নাসিম তারেকের মুহূর্তে সঙ্গীত মহানায়কে পরিণত হওয়ার বিষয়টি কাব্যিক-কুশলতায়, অসাধারণ চিত্রকল্পে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে : 'সত্যিকারের কিন্নর কণ্ঠ।...তার কণ্ঠে ছিল বর্ষার গাঢ় শ্যামলিমা, স্বপ্নিল মেদুরতা, সিক্ত যূথীর গন্ধবেদন, নিবিড় তিমির রাতের উতল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস। ছায়া ঘনিয়ে এলো সারা অডিটরিয়ামে, শ্রোতাদের মনের বনে বনে।'(শামসুর, ২০০৭: ১১) বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের 'ভরাট, রহস্যলোকের স্মৃতি-সঞ্চারী গলার চেয়েও' সুরেলা তার কণ্ঠসুর। প্রথম আত্মপ্রকাশেই তার চারপাশে ভক্তকুলের সমাবেশ, 'অটোগ্রাফ শিকারের ব্যাকুল খাতা', বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ে অনার্স পড়ুয়া সুন্দরী মেয়ের মুগ্ধতা, প্রাইভেট কোম্পানির বড় কর্তার একক অনুষ্ঠান স্পন্সর করার প্রস্তাব, তার ঝলমলে সুন্দরী স্ত্রীর ফ্যানসুলভ ভঙ্গি, ভক্তের ফুলেল অভ্যর্থনা—এ সবকিছু একজন নতুন শিল্পীর জন্য অকল্পনীয় ব্যাপার। নিজেকে মহিমময় করে নাসিম তারেকের এই নিটোল মনোনাট্য রচনা একজন কল্পনা-মনীষাদীপ্ত কবির পক্ষেই সম্ভব। উল্লেখনীয়, যেখানে নাসিম তারেকের কবিকল্প ভাবনার বিস্তার ঘটেছে, সেখানেই পরিলক্ষিত হয় ভাষার কবিত্বময় পরিচর্যা — উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের সমৃদ্ধ ব্যবহারে উপন্যাসের গদ্য-শরীর হয়ে ওঠে কবিতাপ্রতিম। বাস্তবে যা নয় বলে তার দীর্ঘশ্বাস, কল্প-ডানায় ভর করে সেই যন্ত্রণা মোচনের শৈল্পিক চিকিৎসার প্রয়াস নাসিমের মধ্যে লক্ষণীয়। কল্পনা যেখানে শেষ, কল্প-দৃশ্য মুছে যায় চোখের পলকে, কল্পবিহারী মন পা রাখে মুমূর্ষু বাস্তবে, সেখানে দুর্গন্ধ আর অভাব নিয়ে নাসিমের জন্য অপেক্ষা করে ছোট্ট খোপ-ঘর। মুহূর্ত সময়ের মধ্যেই মুছে যায় স্বপ্নরঙিন ভুবন, যেন নেমে আসে এক ঘন অন্ধকার—কালো কালি মুছে দেয় রঙের বর্ণময় প্রচ্ছদ; কল্প-ভুবনের প্রান্তিক-রেখা ছুঁয়েই নিকট ও বৈরী প্রতিবেশীর মতো অবস্থান

করে রক্তক্ষরা বাস্তব। তার চরিত্রের এক বিন্দুতে অনন্ত ভার নিয়ে ঝুলে থাকে দৈনন্দিনতা আর সংক্রামী বাস্তব, অন্য বিন্দুতে স্বপ্ন-সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বচারী বেলুন—এই দুই প্রান্ত পারস্পরিক বৈপরীত্য নিয়ে নাসিমের মানস-সত্তায় সার্বক্ষণিক দ্বৈরথে লিপ্ত। এই দ্বৈরথ নাসিমের, সর্বোপরি চিরায়ত মানবভাগ্যের এবং কবিস্বভাবেরও।

নাসিমের রয়েছে সৃজনসম্ভব প্রতিভা; কিন্তু সে প্রবলভাবে সৃজনবিমুখ আত্মবিশ্বাসহীনতা ও 'ছিটেল' চারিত্র্যের কারণে। তবে সুপ্ত শিল্পীসত্তার ঝিলিক লক্ষ করা যায় তার মনোজ্ঞ ফিচারসমূহে। সৃজনশীল প্রতিভা আর পেশাগত নিষ্ঠার কারণে নাসিম সাপ্তাহিক 'অলকানন্দা' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আখতার হামিদের নিকট বিশেষ প্রিয়ভাজন। তিনি বরাবরই নাসিমের অন্তর্গত সৃজনশীল সত্তার উজ্জীবনে উৎসাহ দেন; কিন্তু বস্তুত ওই উৎসাহ নিষ্ফলা। পেশাগত কারণেই সিনেমার প্রধান নায়িকা নমিতার সঙ্গে তার পরিচয়। চোখে চমক-লাগানো, রক্তে নেশা-ধরানো বাণিজ্যিক দুনিয়ার যৌবন-পসারিণী নায়িকা নমিতার প্রতি সে এক তীব্র প্রেমানুভূতি অনুভব করে। নমিতার প্রতি নাসিমের মুগ্ধতা স্বপ্নবিদ্ধ জীবনের গভীরতর অতৃপ্তি মোচনের অভিপ্রায়-সঞ্জাত। কিন্তু এই প্রেম প্রকাশরহিত, অসম, ফলাফলবিহীন। ভোগপ্রিয়, বিলাসমগ্ন এই সৌন্দর্যময়ীর কাছে দারিদ্র্যদীর্ণ ব্যক্তির হৃদয়ের মূল্য সামান্যই। ফলে নাসিম তারেক এক চরম নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত বিচূর্ণ সত্তায় পরিণত হয়। নমিতার প্রতি নাসিমের হৃদ্‌চাঞ্চল্য ও দোলাচলের প্রতীকী ব্যঞ্জনা ধরা পড়েছে উদ্ধৃতাংশে :

> নাসিম যখন-তখন নিউজপ্রিন্ট প্যাডে পাখি আঁকে। চকখড়ি চকখড়ি চক, এই এঁকেছি বক। তাই আলী জমির হাসি মেশানো কণ্ঠে বলেন, 'আজ কোন পাখিটাখির দেখা পাচ্ছি না।'
> 'মনোটনি কাটানোর জন্যে আজ হরিণের দিকে ঝুঁকেছি।'
> 'ও এটা হরিণ বুঝি, আমি ভেবেছি জিরাফ।' আলী জমিরের কথা শুনে নাসিম হো হো করে হেসে ওঠে।
> 'জবর বলেছেন জমির ভাই।' নাসিম সিগারেটে ছোট করে টান দেয়। এ্যাশট্রেতে ছাই ঝেড়ে হরিণের চোখের প্রতি মনোযোগী হয়। হরিণের চোখ কুকুরের চোখ হয়ে গেল কী করে?
> 'হরিণটাকে বুঝি কিছুতেই বাগ মানাতে পারছ না ভায়া।' বলে আলী জমির। (শামসুর, ২০০৭ : ১৭)

পাখি এখানে নাসিমের ঊর্ধ্বচারী নীলিমাবিহারী সত্তার প্রতীক। তার এলেবেলে, উদ্ভ্রান্ত, বিষণ্ন মন সংহতি পেতে চায় স্বপ্ন-সৌন্দর্যমণ্ডিত জগতে। হরিণ এখানে নাসিমের নমিতাকেন্দ্রিক কামনার অধরা সৌন্দর্যজগৎকে দ্যোতিত করে; নাসিমের কামনার জগৎ হরিণের মতোই চঞ্চল, অস্থির। কামনার হরিণ বাগে আসে না; মুহূর্তের বিন্দুতেই ভিন্নতর অস্তিত্ব জিরাফে পরিণত হয়। এই অংশে ব্যর্থতার বিষাদ চেতনার সহনসীমার মধ্যেই থাকে। কিন্তু হরিণের চোখ কুকুরের চোখে রূপান্তরণ মুহূর্তেই আমাদের চেতনাজগৎকে বিপর্যস্ত করে দেয়; আমাদের সামনে প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে সৌন্দর্য-কামনা ও বাস্তবের দ্বৈরথে নাসিমের রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত, অতৃপ্ত অন্তর্জগৎ। এমনটি লক্ষণীয় রাহমানের কবিতায়ও। বিরোধী, অসুন্দর বাস্তবকে তিনি পাখি, হরিণ, ঘোড়ার প্রতীকতায় রূপান্তরিত করেন। *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কাব্যগ্রন্থের "সেই ঘোড়াটা" কবিতা উল্লেখনীয়।

সেই বেতো ঘোড়াটা নর্দমার কাছের আস্তাবলে ফিকে অন্ধকারে ঝিমুচ্ছে 'নিঃশব্দে কোনো আফিমখোরের মতো, মাঝে-মাঝে শুধু/ফোলা পা নাড়াচ্ছে ঘাড় বাঁকিয়ে'। ঐ নিস্তেজ শীর্ণ ঘোড়াটাও তার বুড়ো সহিসের মতো স্মৃতি ও স্বপ্নে সমর্পিত। হতাশ ও নীরক্ত বাস্তবতা, তাড়িখোর প্রৌঢ়, ছেঁড়া ন্যাঁকড়া, খড়কুটো, থ্যাঁতলানো ইঁদুর আর নোংরা নর্দমার মধ্যে সেই ঘোড়াটি এক সময় কবির দুর্মর বাসনা ও স্বপ্নের প্রতীক হয়ে ওঠে। ক্লান্তি, ক্লেদ ও অপস্মার নাকচ করে দিয়ে ঘোড়াটি অলৌকিকভাবে নিমেষেই শূন্যতাকে বানিয়ে ফেলতে পারে স্বপ্নপূরণের পারিজাত :

আস্তাবলের সেই বেতো ঘোড়াটা নিমেষে
তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে উঠলো, আশ্চর্য এক ফুল হয়ে
জন্ম নিলো তার ইচ্ছা, শিরায় শিরায়
সঞ্চারিত হলো সে ফুলের সৌরভ।...
মুহূর্তে মুছে গেল সময়ের সব ব্যবধান,
মেঘের বৈভবে সে ফিরে পেলো তার অবলুপ্ত ক্লান্তি
আর ভেসে চললো আকাশ থেকে আকাশে অক্লান্ত গতিতে
কবির মতো নিঃশঙ্ক, সহজ, একা।
("সেই ঘোড়াটা": *দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*)

এখানে ঘোড়া ক্লিষ্ট প্রাত্যহিকতাকে স্ফারিত করে যাওয়া স্বপ্নপ্রস্থানের অন্য নাম।

নিয়ত মন্তাজ উপন্যাস মূলত নায়ক নাসিম তারেকের দারিদ্র্য-জর্জর বাস্তবতা ও অন্তর্ময় সৌন্দর্যলোকের মানস দ্বৈরথ এবং পরিণামে উন্মূলিত ও মীমাংসাহীন সত্তায় পর্যবসিত হওয়ার ইতিবৃত্ত। নায়কের করুণ-রঙিন পরিণতির বাঁকে বাঁকে গভীর তাৎপর্য নিয়ে সাম্য-প্রতিসাম্যে হাজির হয়েছে বিভিন্ন চরিত্র-পাত্র, এমনকি প্রকৃতি পর্যন্ত। চরিত্রগুলোর উপস্থিতি সংক্ষিপ্ত, অসম্পূর্ণ অথচ সংহত; নায়কের পরিণাম সঞ্চারের অনুষঙ্গে অনিবার্য। এরা এসেছে নায়ক-লগ্ন হয়ে; কখনো নায়কের যন্ত্রণা বয়ে, নয়তো অন্তর পরিপ্লাবী সৌন্দর্য-সৌগন্ধ্য নিয়ে; কখনো নায়কের কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে, আবার কখনো পার্শ্ব-জনের মনের গহন অতল থেকে স্মৃতির রেখা ধরে। এরকম কল্পনাবয়ন রাহমানের কবিতাশৈলীর অনুরূপ।

নাহিদ নাসিমের সাদামাটা দৈনন্দিন জীবনের এক বর্ণহীন সত্তা। হাড়-বের-করা দারিদ্র্যের ম্লানিমা আর পরিপার্শ্বের অষ্টপ্রাহরিক দুঃসহ ক্লিষ্টতা নিয়েই নাসিমের জীবনে নাহিদের উপস্থিতি। নাহিদময় জীবন নাসিমের কাছে একঘেয়েমিপূর্ণ, ছন্দহীন, আনন্দ-রিক্ত, বিস্বাদময় ও অনুজ্জ্বল। হালকা পাউডার মাখা নাহিদের পানসে সৌন্দর্য তার মনোলোককে পরিতৃপ্ত করতে অক্ষম; নাহিদ নাসিমের কল্পনাপ্রবণ মানস সৌন্দর্যের বাতিঘর নয়। নাসিম আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ হয় অনিন্দ্য-সুন্দর নায়িকা নমিতার প্রতি, যার মুখাবয়বে কড়া প্রসাধনীর মোহময় প্রলেপ; যে ঝলমলে, বর্ণাঢ্য ও চাকচিক্যময় জীবনে অভ্যস্ত ও মোহগ্রস্ত। উপন্যাসে তার উপস্থিতি নাহিদের বৈপরীত্যে। নাহিদ নাসিমের জীবনে যেন দৈনন্দিনতা-লিপ্ত কর্কশ গদ্য; আর নমিতা স্বপ্ন-সৌন্দর্যময় এক মোহন কবিতা। নমিতার প্রদীপ্ত অস্তিত্বের প্রতি নাসিমের মুগ্ধতা ধীরে ধীরে প্রমত্ততায় পর্যবসিত

হয়। কখনো সে 'টোমাটো কালারের' 'ডেলুক্স' টয়োটায় কোনো সুন্দরী তরুণীকে দেখে ছুটে গিয়েছে নমিতা-বিভ্রমে; কখনো সংগুপ্ত আবেগে ফেটে পড়ার তীব্র চাপে অসুস্থ কন্যার প্রতি পিতার স্নেহময় দায়িত্ব উপেক্ষা করে উন্মাদের মতো ছুটে গিয়েছে নমিতার বাড়ির দিকে; কখনো তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে আত্মপরিচয়লোপী উগ্রতা :

> নাসিম তারেক এই মুহূর্তে এই আলো-আঁধারিতে লনপ্রান্তে সাপ্তাহিক অলকানন্দার কর্মচারী নয়, কোন চলচ্চিত্র সাংবাদিক নয়, নয় নাহিদের স্বামী কিংবা তানির পিতা। হালকা হাওয়া তার সেই পরিচয় যেন কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে। সে এখন শুধু নাসিম তারেক, একজন পুরুষ, যে প্রবল প্রেমিক, বেপরোয়া, জীবনের সৌন্দর্য লুণ্ঠনকারী।... এক সময় এক ভিড় তারার নিচে লনের ঘাসে দাঁড়িয়ে একে অন্যের তুমি হয়ে গিয়েছে। এই তুমি শব্দটির মধ্যে যুগ-যুগান্তের সোহাগ রঙিন চৌরাহা আছে, আপনতা আছে, বর্ষারাতের পর সূর্যোদয় আছে, বসন্তবিলাসে ভরপুর হৃদস্পন্দন আছে। (শামসুর, ২০০৭ : ২৪)

কোলাহলময়তা থেকে দূরে, প্রান্তিক নির্জনতায় হালকা হাওয়া, আকাশে তারার মোহন জটলা; চারদিক পরিব্যাপ্ত করে আছে আলো-ছায়ার মায়াময় পরিবেশ। প্রকৃতির এই কোমল আবহ প্রেমের জন্য আদর্শ-মান্য। কিন্তু প্রকৃতির এই নরম আবরণ ভেদ করে আমরা অনুভব করি — এটি বাস্তবের গ্লানিময় পরিচয় ভোলার চেষ্টায় লিপ্ত এক দ্রোহী সত্তার করুণ ক্রন্দন। লক্ষণীয়, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে 'তুমি' শব্দটির আনুভূতিক তাৎপর্য প্রকাশের এই ধরনের কাব্যিক পরিচর্যা উপন্যাসকে কবিত্বময়তা দান করে। সমাজ-সংসারের প্রচলিত কাঠামোকে ভাঙার সমার্থক হয়ে ওঠে কবি আলতাফ মাহমুদের সংসার-ভাঙা প্রেম ও বিয়ে।

নাসিমের কাছে নমিতা দুর্বহ জীবন বহনের প্রেরণাদায়িনী শক্তি। নমিতার উপস্থিতিতে নীরবতা পায় অপরূপ বাঙ্ময়তা, সত্তায় ঝংকার তোলে শত সুর, অর্থশূন্য জীবন পায় প্রবল অর্থময়তা, জীবন হয়ে ওঠে সৃষ্টির অপূর্ব উপঢৌকন, কবিতাময়। যদিও চলচ্চিত্রের ঝলমলে আলোয় নমিতাকেই সে চেনে, এবং এই নমিতার রূপেই সে মোহমুগ্ধ, তবুও নমিতাকে সে কামনা করে তার অকৃত্রিম রূপে, একান্ত প্রাতিস্বিকতায় :

> ...অন্য এক মানবী, যে কোন ফিল্মের সংলাপ আওড়ায় না, অন্যের হয়ে ভালবাসার পার্ট করে না, তার নিজের কথা বলে নিজের মত করে, তার অন্তর্লীন অনুভূতিমালা প্রকাশিত হয় তার নিজস্ব ভাষায়, যে ভাষা ওর অস্তিত্বের মর্মমূল থেকে উৎসারিত, লতা-গুল্মে আচ্ছাদিত গোপন কোন ঝরনার মত। (শামসুর, ২০০৭ : ২৩)

নমিতা নিজের 'নমিতা' পরিচয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতন, অতি সাধারণ নমি থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফিল্ম স্টারে পরিণত হতে তাকে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে। ফিল্ম স্টার হিসেবেই তার জৌলুস ও খ্যাতি; এই পরিচয়েই তার অস্তিত্ব, এর বাইরে সে জ্যোতিহীন, বর্ণরিক্ত। তাই আর্কল্যান্ডের প্রদীপ্ত আলোর নিচে কৃত্রিম জীবনে কখনো কখনো ক্লান্তি অনুভব করলেও এই জীবনের প্রতিই তার প্রবল আসক্তি। হৃদয়ে নাসিম তারেকের প্রতি মুগ্ধতা অনুভব করলেও সে নাসিমের অভাবস্পৃষ্ট, অনুজ্জ্বল জীবনের সঙ্গে জড়াতে চায় না। নমিতার আত্মকথনে বিম্বিত হয়েছে তার প্রকল্পিত দাম্পত্য জীবনের ছবি এবং সেখানে নাসিমের অবস্থান :

আমি শেষ পর্যন্ত দেখেশুনে একজন শাঁসালো বিজনেসম্যানকেই বিয়ে করব। তার সঙ্গে লাভ্ হতে পারে, না-ও হতে পারে; তবে লাভ আমার হবেই। চলবে আমার সংসারযাত্রা, যদি না চীনামাটির বাসনের মত ঝন-ঝনিয়ে ভেঙে যায় আমাদের বিয়ে। আমি কি নাসিম তারেককে ভুলে যাব? অবিশ্যি ওর নামের জপমালা আমার হাতে থাকবে না, তবে আমার মনের নিঝুমপুরে সে থাকবে। মাঝে-মাঝে সুটিং থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে ওর কথা ভেবে মন কেমন করবে আমার। (শামসুর, ২০০৭ : ৫৫)

নগর জীবন বিবিক্ত, ক্লেদাক্ত, বিচ্ছিন্ন, মানবিক সম্পর্করহিত, সর্বোপরি নিরাপত্তাহীন। নগরের প্রবল ভিড়ে মানুষের নিঃসঙ্গতা হয় নিঃসীম ও মর্মন্তুদ। অচেনা, অন্তঃসারশূন্য, রিক্ত নগরে জীবন খুব তুচ্ছ, যাকে মাপা যায় কফির চামচে। নগরের প্রচণ্ড ভিড়ে জীবনের ব্যাকরণ ভেঙে পড়ে, চেতন-অবচেতন-অচেতন জগৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। ব্যাকরণহীন জীবনের বিচূর্ণিত ভাবনার প্রকাশে ভাষার যতিময় শৃঙ্খলা অচল হয়ে যায়। নায়করাজ আবিদ আয়োজিত কল্পিত পার্টির কোলাহলময় পরিবেশে দানবীয় নগরীর নিঃসঙ্গতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত নাসিমের মগ্নচেতনায় ধরা পড়ে ভেঙে পড়া জীবনের করুণ এলোমেলো ছবি :

কেমন আছেন এইতো এই শাড়িটা কোথাকার হিরো কোথায় আজব দুনিয়ার স্ক্রিপ্টটা দারুণ আনোয়ার সাহেব ছবিটা রিলিজ করতে পারছেন না আপনি কি অনুদান পেলেন একটু এদিকে আসবেন আমার আগামী ছবির চিত্রনাট্য আপনাকে লিখে দিতে হবে রুখসানা একটু মুটিয়ে যাচ্ছে ফিগার স্লিমরাখা দরকার মুশতাক এলো না ওর সুটিং আছে। আশরাফ হোসেন দীপ নিভে গেল নিয়ে আজকাল ব্যস্ত সোডা আইস লট অব লাইলী-মজনু শেষতক রিলিজ হয়ে গেল এর পরে নকলের অভিযোগে কোন ছবিকে আটক করার কোনো মরাল রাইট রইল না এই যে এদিকে ভাই মীট বলটা চমৎকার না হুইস্কি নয় বীয়ার এত দেরি কেন হিরো আপনার হাত খালি একটু পরে আমি ওকে এ লাইনে ইনট্রোডিউস করলাম আর সে-ই আমাকে ল্যাং মারছে কে চিনত ওকে আজ পর্যন্ত একটা কানাকড়ি পাই নি নমিতাকে সাদা শাড়িটায় খুব মানিয়েছে আমি সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলি ভাই না ওকে গ্যাস দিতে পারব না একদিন আমরা একটু আলাদাভাবে বসব। (শামসুর, ২০০৭ : ২১)

নির্বান্ধব জীবনে আলী জমির ও কবি মাসুদ আলতাফের সঙ্গে নাসিম অনুভব করে গভীর অন্তরঙ্গতা। তাদের অন্তর্নিহিত কবি-সত্তা নাসিমের সঙ্গে সেতুবন্ধ তৈরি করেছে। আটান্ন বছরের আলী জমির আর ত্রিশ বছরের নাসিম তাদের মজ্জাগত কল্পনাপ্রবণতার কারণেই একই সমতলের বাসিন্দা। আলী জমির সুরছুট মানুষ; কিন্তু ছিন্নসুরকে জোড়াতালি দেওয়ায় সে সর্বদা তৎপর। সুদূর কালের এক নিঝুমতা সুরময় হতে চায় জমিরের কণ্ঠে। আলী জমিরের স্মৃতিসূত্রবাহী ঈশ্বরদীর নীলিমা মিত্তির নাসিমের স্বপ্ন-চেতনায় নারীর এক অবিনশ্বর প্রত্ন-প্রতিমা হয়ে ওঠে। আলী জমির আর নীলিমার কাঁচা বয়সের প্লেটনিক ভালোবাসার কথা শুনে নাসিমের চেতনালোক প্রভাবিত হয়। নাসিমের নমিতামগ্ন হওয়ার তাৎক্ষণিক প্রেরণা জুগিয়েছে এই নীলিমা মিত্তির। আর নমিতা যে তার জীবনে কেবলি অপ্রাপণীয় সৌন্দর্য-প্রতিমা, পরিণামে নমিতা-নাসিমের ভালোবাসা যে প্লেটনিক স্তরে উন্নীত হয় তার দূরবাহী প্রেরণা রয়েছে নীলিমা-জমিরের প্রেমোপাখ্যানে। জমির-নীলিমার প্লেটনিক ভালোবাসার উপাখ্যানাংশটি উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের নিপুণ পরিচর্যায় অর্জন

করেছে কবিত্বময়তা। সৌন্দর্যমুগ্ধ ও প্রেমসিক্ত দাম্পত্য জীবনলুব্ধ জমিরের কলেজি মন যখন ঝরনাধারার মতো চঞ্চল, তখনই রূপকথার মায়াবি পার থেকে সুরের মূর্ছনা তুলে জমিরের জীবনে নীলিমার আবির্ভাব। হৃদয়সিক্ত নমস্কারে জমিরের প্রেম-নিবেদন আর ছন্দোময় প্রতি-নমস্কারে নীলিমার সাড়া প্রদান—এই নাটকীয়তার মধ্য দিয়েই এক অম্লান প্রেমের শুরু। আলী জমিরের বিক্ষিপ্ত হৃৎচাঞ্চল্য সংহতি পায় নীলিমাকে কেন্দ্র করে। নবীন দয়িতার সৌন্দর্যের তরঙ্গতুল্য উপস্থিতি তার হৃদ্‌স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়, অপরূপ মায়াময় দৃষ্টিতে ছলকে ওঠে তার বুকের রক্ত। নমস্কার-প্রতিনমস্কারে আর ন্যাভাল কোডের মতো সংকেতে বিনিময় হলো তাদের মুগ্ধতা। সামান্য নমস্কারে অপরূপ মুখরতা পেল তাদের হার্দিক আবেগ। দুই পারের দুই বাসিন্দা এক পারে মিলিত হতে পারেনি, পায়নি মুখোমুখি বসার আবেগী সুখ; কিন্তু দারুণ মুখর হয়ে উঠেছিল তারা। সমকালের যে সাম্প্রদায়িক ঝড় সম্পর্কে সে ছিল উদাসীন, সেই ঝড়ই হৃদরক্ত ঝরালো তার, তছনছ করে দিল তার মোহন বাগান, নীলিমাকে নিয়ে গেল আরো দূর নীলিমায়। অনন্ত ব্যবধান রচনা করে নীলিমা নীলিমাই রয়ে গেল জমিরের জীবনে। এক স্তূপ বেদনা বহন করেই নীলিমার প্রস্থান : 'আমরা দুজন দাঁড়িয়ে আছি দু'দিকে, মাঝখানে অনন্ত ব্যবধান। ওকে মনে হলো নিষ্প্রদীপ উৎসবের মতো। কেমন নিঃসাড়, নিষ্প্রভ। এক স্তূপ বেদনার মতো মনে হলো নেপথ্যচারিণী নীলিমাকে।' (শামসুর, ২০০৭ : ৩২) নমস্কারের প্রদীপ্ত বিভা স্মৃতিসত্তায় মেখে নিয়ে জমিরকে রিক্ত, নিঃস্ব ধু-ধু মরুময়তায় নিক্ষিপ্ত করে নীলিমা ছুটে গেল অনন্ত ব্যবধান তৈরি করে। প্রকৃতির রিক্ত রূপের চিত্রকল্পে অসামান্য অভিব্যঞ্জনা পেল জমিরের প্রবল নৈঃসঙ্গ্য, শূন্য-বিধ্বস্ত অস্তিত্ব : 'আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। একা। প্লাটফরমে ছেঁড়া শালপাতা, পুরনো কাগজ আর সিগারেটের বাতিল প্যাকেট।' (শামসুর, ২০০৭ : ৩২)

আলী জমিরের অন্তর্লোকের গহন নির্জনতায় নীলিমা মিত্তির অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে অবিনশ্বর হয়ে আছে কালের ক্ষয়ের নিয়মকে অস্বীকার করে। মনের গহীন কোণে জমে থাকা প্রেমের সুধাময় স্মৃতি বাস্তবের প্রহার-জর্জর মনকে শান্তি জোগায়। প্রেম এখানে সঞ্জীবনী সুধার মতো, ঘা-খাওয়া জীবনে আরামের এক নরম প্রলেপ : 'আটান্ন বছর বয়সের আলী জমির নাসিমের কাছে নীলিমাকে ডেকে এনেছেন শ্রীমণ্ডিত এক ভাস্কর্যে, যা কালের সংহারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসামান্য নির্জনতায়। এই ভাস্কর্যে প্রকৃত নীলিমা। এই নীলিমার বয়স বাড়ে না কোনোদিন, বিয়ে হয় না, হয় না সন্তান-সন্ততি; এই নীলিমার চুল পাকে না, দাঁত নড়ে না, বাতের ব্যামো হয় না।' (শামসুর, ২০০৭ : ৩৩) আটান্ন বছরের প্রৌঢ়ত্বে এসেও আলী জমির কাঁচা বয়সের আবেগবিহ্বল কয়েকটি দিনের স্মৃতি আগলে রাখে; নমস্কারে নমস্কারে গুনগুনিয়ে ওঠে তার সমগ্র সত্তা। এই স্মৃতি তার মরুময় জীবনে 'মরূদ্যানের মতো'। নাসিম তারেকের মতে, 'এই ছেলেমানুষটি তার মজাদার খেলা বন্ধ করে দেবে যেদিন, সেদিন থেকেই খতম হয়ে যাবে বেঁচে থাকার আনন্দ।' (শামসুর, ২০০৭ : ৩৪) এই কল্পনাপ্রবণতা নাসিমের মজ্জাগত, শৈশব-কৈশোর-বাহিত : 'চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে, পথ চলতে চলতে সে মনে মনে কথা বলে, আড়ি পাতলে সেসব কথা শোনা যায়।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৩) কল্পনার অপার

জগতে তার অবাধ বিচরণ; সেখানে কোন হোঁচট নেই, অপ্রাপ্তির হতাশা নেই, সব পাওয়ার আনন্দ আছে, অসম্ভবকে সম্ভব করার তৃপ্তি আছে। ওড়ার জন্য কল্পনার পাখা যেন সে সবসময় মেলেই রাখে। খররৌদ্রে রাজপথে, অফিস কক্ষে, দুর্গন্ধযুক্ত গৃহকোণে—সর্বত্র যখন-তখন নমিতা তার কল্প-পথে হানা দেয়। কিন্তু বাস্তবে তার কল্পনার জগৎ পুরোটাই ভোজবাজি। কল্পনার বেলুন যখন চুপসে যায়, তখন উন্মোচিত হয় একজন রিক্ত, নিঃস্ব, অভাবতাড়িত ও হতাশাগ্রস্ত মানুষের মর্মন্তুদ অন্তর্যন্ত্রণা ও হাহাকার। নাসিম বিছানায় শুয়ে শুয়ে কল্পনায় দৃশ্য-পরম্পরা সাজাতে সাজাতে এক সময় বাস্তবের প্রান্তে উপনীত হয়, যেখানে অভাব এসে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়ায়। তখন অনুভূত হয় ,কল্পনার দৃশ্যগুলো জোড়াতালি দিয়ে স্ক্রিন প্লে তৈরি করলে সংসারের টানাপড়েন কিছুটা লাঘব হতে পারে : 'নাহিদ অনেকদিন থেকে একটা ভাল শাড়ি কিনতে চাইছে, কিন্তু কিনি কিনছি করে আর কেনা হচ্ছে না। এ বাজারে দামি শাড়ি কেনা চাট্টিখানি কথা নয়। গুচ্ছের টাকা দরকার। স্ক্রিন প্লে লেখার অফারটি কবুল করলে একটি কেন, বেশ কয়েকটি শাড়ি কিনে ফেলা যেত।' (শামসুর, ২০০৭ : ২৪) তবে কল্পনার জাল ছিঁড়ে গেলেও সে মনে মনে অপসৃত দৃশ্য জোড়াতালি দিয়ে পুনর্নির্মাণে তৎপর হয়। জীবনের সঙ্গে সে লুকোচুরি খেলে, আত্মপ্রতারণার চোরাবালিতে থাকতে চায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কিন্তু নাহিদ হেঁচকা টানে কল্পনার জাল ছিঁড়েখুঁড়ে নাসিমকে নামিয়ে আনে বাস্তবতার ঘেরাটোপে। নাহিদ নাসিমের মনোজগতের কল্পনাবিলাসে মূর্তিমান উপদ্রব। তাই নাহিদের প্রতি নাসিমের মনে উদ্রিক্ত হয় এক গভীর সংক্ষুব্ধ বিরাগ।

নাসিম ব্যক্তিগত জীবনে একজন সাধারণ গৃহী মানুষ; স্ত্রী ও এক কন্যার সমবায়ে টানাটানির সাদামাটা সংসার। একমাত্র কন্যার প্রতি তার অপত্যস্নেহ; স্বামী হিসেবে সে দায়িত্বশীল । নতুন চাকরি, সামান্য বেতন, আর্থিক সঞ্চয় নেই। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে তার মন সবসময় অস্থির ও নিরাপত্তাহীন। এই নিরাপত্তাহীনতা তার সত্তায় ঢুকিয়ে দেয় মৃত্যুর শীতল পরশ। চড়া রোদে মেজাজ-খিচড়ানো রিকসাওয়ালার সামীপ্যে নাসিম দারিদ্র্যের কাঠিন্য প্রত্যক্ষ করে। জীবনের রুদ্র বিরূপতা যেন প্রকৃতির ঝাঁঝালো উপমাতেই সংকেতিত : 'দুপুর ভাদ্র মাসের কুকুরের মত হাঁপাচ্ছে, চড়চড়ে রোদে ছ্যাঁকা পড়ছে চামড়ায়, রিকশা চালাতে চালাতে অলরেডি হাফজান।' (শামসুর, ২০০৭ : ৩৯) রোদ-বৃষ্টিতে জিহ্বা বেরিয়ে-আসা পরিশ্রমে রিকসাওয়ালার করুণ পরিণতি কল্পনা করে নাসিম : 'হয়তো লোকটার গলা দিয়ে একদিন গল-গলিয়ে রক্ত বেরুবে। ধুঁকে ধুঁকে মরে যাবে একদিন, ওর সংসারকে বেনো জলে ভাসিয়ে।' (শামসুর, ২০০৭ : ৩৮)

নাসিম রিকসাওয়ালার পরাভূত অস্তিত্বের স্পর্শ অনুভব করে নিজের মধ্যে। নাসিমের সত্তায় পরাভবের গ্লানি বয়ে আনে আরেকটি চরিত্র—চলচ্চিত্র প্রডিউসার ও ডিস্ট্রিবিউটার আজমল চৌধুরী। রুচিশীল কিন্তু অসফল চলচ্চিত্রের প্রডিউসার আজমল চৌধুরী 'একজন মালীর কর্তব্যনিষ্ঠা নিয়ে...নিজের সংসার বাগানটিকে সাজিয়েছিলেন'। (শামসুর, ২০০৭ : ৪৯) কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে কপর্দকশূন্য অবস্থায় তার মৃত্যুতে 'সেই বাগান ঝড়ো হাওয়ায় বিপর্যস্ত'। আজমল চৌধুরী তাও এক কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন, ছেলেকে এমবিবিএস পাস করিয়েছেন— কাঁধ অশক্ত হলেও চরম দুঃসময়ে সে সংসারের ঘানিটানার

সক্ষমতা অর্জন করেছে। কিন্তু নাসিমের বাগান সম্পূর্ণ অগোছালো; তার অবর্তমানে সংসারের — নাহিদ ও তিন বছরের তানির বিপর্যয়ের কথা ভেবে নাসিম বিপন্ন বোধ করে। এই বিপন্নতাবোধ তাকে গভীর, উতল একাকিত্বে নিক্ষেপ করে : 'একা, একলা, একা। ওর গ্রামের নদীর ঘাটে অন্ধকার রাতে ঢেউয়ে দোল-খাওয়া নৌকোর মত।' (শামসুর, ২০০৭ : ৫০) স্বামী সে, জনক সন্তানের,—এই পরিচয় ও প্রচলিত জীবনবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল নিজেকে সুখী করার জন্য নাসিম উন্মত্তের মতো সংসার-ভাঙার নেশায় মেতে ওঠে। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে চায় না, এড়িয়ে চলে—এটি সর্বব্যাপ্ত এক পারিবারিক বিপর্যয়কেই ইঙ্গিত করে। নাসিমের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে ইঙ্গমার বার্গম্যানের 'দ্য সেভেনথ সীল' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য যেখানে নায়ক দাবা খেলছে মৃত্যুর সঙ্গে। সে তার অস্তিত্বের ভিটেয় অনুভব করে একটি 'ঘুণপোকা', যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে কুরে কুরে খাওয়ার জন্য। কবি শফিক আহমদ এক তরুণীর প্রেমে পড়েছে এবং দ্বিতীয় বার বিয়ে করে 'একটি মহিলা আর দুটো বাচ্চার সর্বনাশ করে একটা নতুন বউ বগলদাবা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' (শামসুর, ২০০৭ : ৪৩) কবি মাসুদ আলতাফ 'প্রথাবিরোধী মানুষ', 'যেকোনো এস্টাবলিশমেন্টের প্রতি খড়্গহস্ত', কিন্তু 'শফিকের স্ত্রী আর পুত্রকন্যার কথা ভেবেই এই ভাঙচুরে সায় দিতে পারছে না'। (শামসুর, ২০০৭ : ৪৫) কিন্তু নাসিম শফিক আহমদের এই সংসার ভাঙার উন্মত্ততাকে সমর্থন করে মানস ঐক্য অনুভব করে বলেই 'আমার মনের ভেতর এমন একটা ইচ্ছা ঘাপটি মেরে আছে? বুজরুকি ছাড় নাসিম, স্বীকার করে ফেল।' (শামসুর, ২০০৭ : ৪৭) আজমল চৌধুরী, কবি মাসুদ আলতাফ আর শফিক আহমদ জাগিয়ে দেয় নাসিমের অবচেতন মনে লালন করা পারিবারিক মূল্যবোধকে। সংবিৎ ফিরে আসে তার; বাঁধ-ভাঙা আবেগ শমিত হয়। গত কয়েকটি উন্মত্ত বেসামাল দিনের ওপর নাসিম মূল্যায়নী দৃষ্টি ফেলে। নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়, গ্লানি বোধ করে। নাসিমের কল্পনা ও বাস্তবে দ্বিপ্রান্তিক তীব্র বৈপরীত্য; দুই রজ্জুর বিপরীতমুখী টানে সে দিশেহারা : 'নরকেও নয়, স্বর্গেও নয়, পার্গেটরিতে আছে।' (শামসুর, ২০০৭ : ৫৭)

আলী জমির, নীলিমা মিত্তির, রিকসাওয়ালা, কবি মাসুদ আলতাফ, কবি শফিক আহমদ, আজমল চৌধুরী, কামরান, তানি—প্রত্যেকেই আপাত বিচ্ছিন্ন; কিন্তু সকলের জীবন-নির্যাস সত্তায় মেখে নিয়েই নাসিম তারেকের নাহিদ-নমিতা কেন্দ্রিক জীবন মীমাংসাহীন পরিণতিতে সমর্পিত হয়েছে। মন্তাজ-তত্ত্বের অসাধারণ প্রয়োগে নাসিমের বৈপরীত্যময় মর্মান্তিক পরিণতি ব্যঞ্জনাবহ তাৎপর্যে উন্নীত হয় : 'নাসিম তারেক যখন বেচারাম দেউড়ির গলিতে খাটা ড্রেন, আমের চোকলা , কাঁঠালের ভুতি আর মরা ইঁদুরের উৎকৃষ্ট দুর্গন্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে দরজার কড়া নাড়ছিল, নমিতা তখন এফ.ডি.সি'র স্টুডিও ফ্লোরে আর্কল্যান্ডের আলোয়, ক্যামেরার সামনে নায়ক আবিদের বাহুলগ্না হয়ে ভালোবাসার ডায়ালগ বলছে আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠস্বরে।' (শামসুর, ২০০৭ : ৫৮)

উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টির পাশাপাশি আলী জমির ও নমিতার উত্তম-পুরুষের ভাষ্যে স্বীকারোক্তিপ্রবণ কবিতার আদলে নিজেদের অন্তর্লোক উন্মোচন এবং নায়কের মনোলোক উদ্ঘাটনে চেতনাপ্রবাহরীতির ব্যবহার — উপন্যাসটির গঠনকৌশলের

বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের কাব্যিক পরিচর্যায় উপন্যাসটি অর্জন করেছে অসাধারণত্ব ।

চার

জীবনানন্দ দাশ "মহাপৃথিবী" শিরোনামের আটপঙ্‌ক্তির তীক্ষ্ণকঠোর কবিতায় দুঃসময়ের অন্ধতা, মহৎ-শিল্প-হৃদয়ভোজী সভ্যতার যে সর্বসংহারমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে, শামসুর রাহমান *অদ্ভুত আঁধার এক* উপন্যাসে অনুভব করেছেন সেই করাল দুঃসময় ঘন অন্ধকার ছড়িয়ে, রক্ত বিছিয়ে আবার ফিরে এসেছে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশে —পাক হায়েনাদের আক্রমণে বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে অদ্ভুত আঁধারগ্রস্ত এক মানচিত্রে, সন্ত্রাসে ক্ষত-বিক্ষত ধ্বংসের গহ্বরে। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষণীতে রচিত হলেও মুক্তিযুদ্ধে নায়কের নিদারুণ ক্লৈবত্বজনিত মনোরক্তক্ষরণ-চিত্রের মনস্তাত্ত্বিক উন্মোচনই পরিণামে উপন্যাসটিতে প্রাধান্য পেয়েছে।

উপন্যাসের নায়ক নাদিম ইউসুফ একজন বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক; দেশের অগ্রসর ও সচেতন নাগরিক। ক্রান্তিকালে, চরম দুঃসময়ে বিপন্ন দেশ তার এই অগ্রসর-চেতন সন্তানদের কাছেই অগ্রণী ভূমিকা প্রত্যাশা করে। কিন্তু বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানি সেনাদের বুটের তলায় ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত, তখন আমরা লক্ষ করি নাদিম ইউসুফ আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় নেয় গ্রামের নির্জন নিস্তরঙ্গতায়; আরাম অনুভব করে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে; আবার এই আপাত আশ্রয়ও নরপশুদের দাঁতাল আগ্রাসনে বিধ্বস্ত হতে পারে—এই আশঙ্কায় সে ভীত-কম্পমান। বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদারদের আক্রমণকে সে প্রবলভাবে ঘৃণা করে, অন্ধকার সময় পেরিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই হবে—এই বিশ্বাস মনের গভীরে লালন করে। যুদ্ধের ময়দানে শরিক হওয়া আজ সময়ের দাবি—এই দাবি নাদিম ইউসুফ সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করে; কিন্তু পলাশতলী গ্রামে নাদিমের অবস্থান আশ্চর্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয় ও জনান্তিক, যেন প্রলয়কে অন্ধের মতো চোখ বন্ধ করে প্রবলভাবে অস্বীকারের প্রতারণামূলক প্রচেষ্টা। কোনো আচরণই দৈব নয়, নয় ব্যাখ্যাতীত; দেশের ঘোর দুঃসময়ে নাদিমের এই আশ্চর্য নির্লিপ্ততার পেছনে রয়েছে বাস্তব কার্যকারণ-সূত্র, যার মূল নিহিত তার শ্রেণিচৈতন্যে, তার গড়ে ওঠার পথ-রেখায়, তার উত্তরাধিকারে এবং সর্বোপরি তার কবিসত্তায়।

উপন্যাসটির শুরু অপরূপ স্নিগ্ধ প্রকৃতির কাব্যিক পরিচর্যায় : 'ঘরের ভেতরে মৃদু আলো। বাইরে পাখির ঐকতান। এক ঝলক হাওয়া ওর শরীরে আরাম বুলিয়ে দিল। একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল। বেলফুলের গন্ধ। জানালা গলে ছোট একটা ডাল ঢুকে আছে, যেন গলা বাড়িয়ে দিয়েছে কেউ। ডালটা একটু কাঁপছে তার একরাশ কালচে সবুজ পাতা আর সাদা ফুটকির মত ফুল নিয়ে।' (শামসুর, ২০০৭ : ৬০) রণোন্মাদনার বীভৎসতায় ক্ষতাক্ত ও বিধ্বস্ত ঢাকা শহর থেকে বহুদূরে পলাশতলী গ্রামের সবুজ, শ্যামল প্রকৃতি নাদিম ইউনুসকে দেয় গভীর প্রশান্তি। তার মধ্যে বিরাজ করে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে পেছনে ফেলে আসার নরম আরাম। তবে নাদিম গ্লানি অনুভব করে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কোনো খবর না নিয়ে, তাদেরকে ঢাকার গনগনে কড়াইয়ের মধ্যে রেখে স্বার্থপরের মতো

পলায়নের জন্য। তারপরও সে পরিবারের নিকট-স্বজনদের নিয়ে নিরাপদে আছে —এটাই তার কাছে আপাত সুখের খবর। নাদিম ঢাকার কথা ভুলে থাকতে চায়; কিন্তু চাইলেই পারে না, ঢাকা ফিরে-ফিরে আসে তার স্মৃতি-চেতনায়, অনিবার্যভাবে; নাদিমের মনে জাগরূক থাকে পঁচিশে মার্চের কালরাত্রি ও তার পরবর্তী সময়ের ঢাকার বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞের খরছবি : 'কেমন গোলমেলে, হিজিবিজি। গুলির শব্দ, চিৎকার, মর্টারের আওয়াজ, আগুন, কারফিউ, লাশ। লাশ, গুলি, ব্যারিকেড, মর্টার, চিৎকার, আগুন, কারফিউ, রেডিও, ভয়ানক আওয়াজ; ছুটোছুটি, কুকুরের ডাক, ট্রাক, জীপ, চিৎকার।' (শামসুর, ২০০৭ : ৬৬) চোখের সামনে পালতোলা নৌকা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার প্রিয় শহর ঢাকার ধ্বংসচিত্র এবং সেখান থেকে আত্মরক্ষার জন্য মরীয়া পলায়নের দুঃসহ অভিজ্ঞতা; দুপুরের চড়চড়ে রোদে একটি নৌকার জন্য উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষা এবং অবশেষে সেই ত্রাতা নৌকা ও মাঝির আবির্ভাবে তাদের উদ্ধার ধরা পড়ে অনন্যসাধারণ উপমাগুচ্ছে, জেগে ওঠে "তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা" কবিতার দূরাগত অনুরণন :

> ওদের সবার চোখে-মুখে আতংকের ছাপ—যেমন তাড়া-খাওয়া পশুদের চোখেমুখে থাকে। নরসিংদী থেকে কোনমতে পালাতে পারলে বাঁচে। তাই নৌকার মাঝির সঙ্গে যখন দরদস্তুর ঠিক হয়ে গেল তখন নাদিমের মন সুন্দরবনের হরিণের লাফের মত চঞ্চল, আনন্দবিহ্বল। এতক্ষণ ওর মনের ভেতর ঈগল আর সাপের যে বিবাদ চলছিল চরম হিংস্রতায়, তার অবসান হল।...এখন গুলির শব্দ নয়, মাটিতে মুখ-থুবড়ে-পড়া লাশ নয় নয়াবাজারের লেলিহান আগুন নয়, ট্রাংকের ঘর্ঘর নয়; তাড়া-খাওয়া মানুষের চিৎকার নয়, এখন পানির নরম স্পর্শ, মাছের উজ্জ্বল ঘাই, নদী তীরবর্তী গাছপালার শ্যামলিমা, আকাশে আকাশে পাখির ওড়াউড়ি, মাঠে ফসলের ঢেউ, কৃষকের ঘরে ফেরা।' (শামসুর, ২০০৭ : ৬৯)

সে ভুলতে চায় সেই বীভৎসতাকে; আশ্বস্ত করতে চায় নিজেকে এবং গ্রামবাসীকে : 'এহানে আইবার পারব না। অগ যত বাহাদুরি সব শহরেই। এই গাঁও-গেরামে আইব মরতে?' (শামসুর, ২০০৭ : ৭১) সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে ঘাতক-সময় পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ মুক্তির মিনারে পৌঁছবে। তার বিশ্বাস অনুরণিত হয়েছে কট্টর মুসলিম লীগ সাপোর্টার নবতিতম বয়সী বড় চাচার অভিজ্ঞ-বাচনে : 'পাকিস্তান আর থাকব না। যা জুলুম ওরা করতাছে, এই জুলুমের পর পাকিস্তান থাকতে পারে না। অগ উপর আল্লার গজব পড়ব।' (শামসুর, ২০০৭ : ৮০) পলাশতলীর নির্জন অবকাশে নাদিম স্মৃতিলিপ্ত হয়; ফ্ল্যাশব্যাকে ভ্রমণ করে তার যাপিত জীবনে। বহির্জীবনে নাসিমকে নিস্তরঙ্গ মনে হলেও তার স্মৃতির তল্লাটে বহমান উত্তাল তরঙ্গমালা, তার অন্তর্লোকে চলছে ভাঙচুর আর আত্মবিশ্লেষণ, কিন্তু কর্তব্যের নিশানা নির্ধারণে সে দ্বিধাচল : 'মনের ভেতর ঈগল আর সাপের যে বিবাদ চলছিল চরম হিংস্রতায়' —এই দ্বিধা থেকে সে উত্তরণ চায়। কবি সে; সাদা পৃষ্ঠায় কালো অক্ষরের যুদ্ধে কবিতার মোহময় জগৎ নির্মাণেই তার পারঙ্গমতা। যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র হাতে রক্ত-ঝরানো তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। বয়সটাও অনুকূলে নয়, যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য যে সাহস ও তারুণ্যদীপ্ত উদ্দীপনার প্রয়োজন তাও তার মধ্যে অনুপস্থিত। কিন্তু অনুজা লীনার দৃষ্টিতে পাঠ করে সে যুদ্ধে যাওয়ার অনিবার্য আহ্বান, যার কিনা পঁচিশ মার্চের কালরাত্রিতে ভয়ানক তাণ্ডবের নিনাদে ফিট হওয়ার অবস্থা হয়েছিল, যার নার্ভ শান্ত রাখতে হয়েছিল ভ্যালিয়াম খাইয়ে।

নাদিম স্মৃতিসমুদ্রে অবগাহন করছে, নিজেকে খুঁজছে সর্বত্র, স্মৃতির গহন অন্ধকার খুঁড়ে খুঁড়ে সে আত্ম-অন্বেষায় মগ্ন। সকল স্মৃতিই নাদিমের সূত্রে, নাদিমকে কেন্দ্র করে, যেখানে লুকিয়ে আছে আজকের নাদিমের গঠন-উপাদান। পরস্পর সম্পর্করহিত টুকরো টুকরো বিভঙ্গ স্মৃতি নাদিমের মানসপটে জেগে ওঠে স্থান-কাল-পাত্রের কার্যকারণ-সূত্রকে তছনছ করে দিয়ে; তবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্মৃতিসমূহ নাসিমের চেতনালোকে মণ্ডিত হয়ে লাভ করে অসামান্য সংহতি। যুদ্ধের ময়দানের অন্তরালে চলতে থাকে আরেক যুদ্ধ—সেটি নাদিমের অন্তর্লোকে, নিজের সঙ্গে। সেই যুদ্ধ অতীতের স্মৃতিলোকে নিমগ্ন বিহার শেষে একটি প্রতীতিতে উপনীত হওয়ার অন্তঃক্ষরিত যুদ্ধ। নাসিমের স্মৃতিতীর্থে বিচরণের কারণ দ্বিবিধ — প্রথমত, বর্তমানের ধ্বংসোন্মাদনা থেকে পলায়ন, দ্বিতীয়ত, মানস-গঠনের জটিল স্তরসমূহ উন্মোচনের অভীপ্সা। এক বিষণ্ন বেদনা অন্তঃসলিলা স্রোতের মতো বয়ে যায় নাদিমের অন্তর্লোকে। পিতার স্মৃতিই নাদিমের মনে সর্বাধিক সঞ্চারিত। পলাশতলী গ্রামের সর্বত্র লেপ্টে আছে পিতার স্মৃতি শুধু একারণেই নয়, এর কারণ আরো গভীরে নিহিত। জীবিতাবস্থায় পিতার সঙ্গে সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রাখলেও নাদিমের মানস গঠনে পিতাই সর্বাধিক প্রভাব-সঞ্চারী। নাদিমের সত্তানিহিত নৈঃসঙ্গ্যের ভ্রূণ পিতার উত্তরাধিকারে। নৈঃসঙ্গ্য মানুষের মনের রজ্জু ধরে ঝুলে থাকে ; এই নৈঃসঙ্গ্য অকারণ ও ব্যাখ্যাতীত। নিজের অস্তিত্বের ভিটেয় এই নৈঃসঙ্গ্য কেউ টের পায়, কেউ পায় না। তবে সংবেদনশীল, সূক্ষ্ম-অনুভূতিপ্রবণ মানুষেরা এক নিঃসীম নৈঃসঙ্গ্যবোধ অস্তিত্বে ধারণ করেই বেঁচে থাকে। কবিতার জন্য, শিল্পের জন্য শিল্পীকে ভিড় থেকে এক সম্ভ্রান্ত দূরত্বে নির্জনতায় অবস্থান করতেই হয়; জনপদে ভিড়ের মধ্যেই অনুভব করে এক সহজাত নৈঃসঙ্গ্য। নাদিম ছোটবেলা থেকেই ঘরকুনো, বাড়ির বাইরে তার বিচরণ ছিল সীমাবদ্ধ, চলত ভিড় এড়িয়ে। নৈঃসঙ্গ্য তার কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু নির্জন নৈঃসঙ্গ্য নয়; সেই নৈঃসঙ্গ্যে সে সম্পন্ন হতে চায়, যার মধ্যে থাকে শিল্প-সম্ভাবনার বীজ। নাদিমের পিতার নাড়ি পোতা রয়েছে শ্যামলস্নিগ্ধ নির্জন পল্লিতে; শহরে তিনি উন্মূল, অভিবাসী। নাগরিক নৈঃসঙ্গ্য আর বিচ্ছিন্নতা তাঁর পরবাসী মনকে বার বার শেকড়মুখী করেছে। গ্রাম ও গ্রামবাসীর সঙ্গে তিনি অনুভব করতেন এক নিবিড় বন্ধন, মরণেও তিনি সেই বন্ধনকে অটুট রেখেছেন গ্রামের মৃত্তিকায় সমাহিত হয়ে। নাদিমের উত্তরাধিকার-বাহিত নৈঃসঙ্গ্য তাকে গ্রামমুখী করেনি; কারণ, গ্রামের সঙ্গে দূরবাহিত সম্পর্ক থাকলেও ঢাকা শহরই তার আপন ভুবন। নাদিমের নৈঃসঙ্গ্য তাকে পিতার মতো গ্রামের শ্যামলতামুখী করেনি, সম্ভবও ছিল না; পরিবর্তে তাকে করেছে কবিতামুখী, সৃষ্টিমুখর। কবিসত্তার মূল্য দিতে গিয়ে নাদিম বাস্তবজীবনের সমৃদ্ধির খেরোপাতার হিসাব ঠিকমত মেলাতে পারেনি অথবা মেলানোর ব্যাপারে ছিল অনীহ। নাদিমের কবিসত্তা একজন স্নেহময়, দায়িত্বশীল পিতার সদয় অনুমোদন পায়নি। বড় আমলা বা ব্যারিস্টার হওয়ার পিতৃ-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অনীহাজনিত ব্যর্থতার কারণে পিতা নাখোশ ছিলেন নাদিমের প্রতি; তাদের মধ্যে রচিত হয়েছিল ব্যবধান। কিন্তু এ ব্যবধানে সন্তানের প্রতি বিরাগ বা বৈরিতা ছিল না, ছিল অভিমান-মিশ্রিত এক অন্তঃশীলা স্নেহময়তা। বস্তু-বাস্তবের দিকে পিঠ দিয়ে চলা এই কাব্যমগ্ন সন্তানের দুর্বহ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্নেহময় পিতা বিপন্ন বোধ করতেন, সন্তানের ব্যর্থতার গ্লানিতে তিনি ম্রিয়মাণ হতেন। বিরুদ্ধ মত অগ্রাহ্য করে সত্যিকারের স্নেহময় ও দূরদর্শী অভিভাবকের মতো পিতা তাদের

জন্য বিপন্ন সময়ের আশ্রয় নির্মাণ করে গেছেন। জীবনের অপর পারে দাঁড়িয়েও স্নেহময় পিতা যেন পরম আদরে সন্তানের মাথায় রাখছেন তাঁর বরাভয় হাত, নিশ্চিত করছেন পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা। নাদিম মরহুম পিতার প্রতি তাই প্রকাশ করে গভীর কৃতজ্ঞতা। পলাশতলী গ্রাম, এর প্রকৃতি, বাবার তৈরি-করা বাড়ি, বিগত স্বজনেরা এবং মরহুম বাবা নিজে অসামান্য মমতায় উদ্বাহু হয়ে আশ্রয় দিয়েছেন বিপন্ন স্বজনদের :

> কাল যখন রাত এগারোটায় ওরা কুকুর ক্লান্ত হয়ে ঢুকলো এই দালানে, তখন কি ভালই না লেগেছিল ওর। ঝিরঝিরে বাতাস, বেলফুলের গন্ধ, রাত্রিমাখা ঘাস; গাছগাছালি আর বাড়ির গন্ধ এক স্বাগত সংগীত হয়ে বরণ করেছিল ওদের। যেন নাদিমের মরহুম দাদা, নানা, দাদী, নানী, খালা, আব্বা — সবাই অভ্যর্থনা করলেন ওদের স্বর্গীয় হাসি দিয়ে। ভাগ্যিস, এই বাড়িটা আব্বা বানিয়েছিলেন আমাদের অপছন্দের তোয়াক্কা না করে। (শামসুর, ২০০৭ : ৬৩)

জনকের এই স্নেহপরায়ণ, দায়িত্বশীল অভিভাবকত্ব নাদিমের মনে-মগজে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তাই সে যখন পরিবারের কর্তা ও জনকের ভূমিকায়, তখন সময়ের দাবি মেটানোর তাড়নায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েও সরে আসে মজ্জায় নিহিত পৈতৃক শিক্ষার কারণে : 'নাদিম সিদ্ধান্ত করল যে সে সীমান্তের ওপারে যাবে, শরিক হবে মুক্তিযুদ্ধে। ... নাজমা ওরা এখানেই থাকবে। হয় ঢাকায়, নয়ত পলাশতলীতে। এ-কথা মনে হতেই একটু দমে গেল নাদিম। এদের কী হবে ? এক ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে এদের রেখে চলে যেতে হবে। ... নেকড়েদের ভিড়ে এদের রেখে চলে যাব একা একা?' (শামসুর, ২০০৭ : ৯৪)

প্রিয় শিক্ষক, আদর্শ-মান্য ব্যক্তিত্ব ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার উদার মানবিক জীবনবোধ তার চেতনায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। লিবার‍্যাল হিউম্যানিস্ট বলেই তার পক্ষে সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্ভব ছিল না। যুদ্ধে হৃৎচাঞ্চল্য বেমানান, তাই স্থগিত থাকে প্রেম। তাই যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত উপন্যাসে প্রেমের উপস্থিতি প্রয়োজনহীন অথবা তাৎপর্যহীন বিবেচিত হতে পারে। আলোচ্য উপন্যাসেও নাদিমকে কেন্দ্র করে চার নারীর যে মণ্ডল তৈরি হয়েছে, তা বাড়াবাড়ি এবং উপন্যাসের সাংগঠনিক ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কিন্তু নাদিমের সাপেক্ষে নারী-চতুষ্টয়ের সমন্বয়ে চতুর্ভুজ কাঠামো নির্মাণ এবং পরিণাম সঞ্চারে অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় ভূমিকা *অদ্ভুত আঁধার এক* উপন্যাসটিকে বিশেষ তাৎপর্য দান করেছে। মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়পর্বে নাদিমের জনান্তিক ভূমিকার অন্তরালে অন্তর্গূঢ় প্রভাব সঞ্চার করেছে এ-সকল নারী ও প্রেম। প্রথম যৌবনোন্মেষের কালে নাদিমের জীবনে কামনার তপ্ত সৌরভ ছড়িয়ে হাজির হয়েছিল সামিনা। সামিনার প্রতি প্রেম অনুভব না করলেও নাদিম তার সঙ্গে শরীরী সম্পর্কে প্রবলভাবে জড়িয়েছিল। উত্তাল যৌবনের প্রবল আবেগী ও যুক্তিহীন উদ্দামতাই প্রেমরিক্ত শরীরী-সম্পর্কে নাদিমকে উদ্বুদ্ধ করে। আর এই নবীন বয়সের উদ্দাম, বেহিসাবি আবেগই মানুষকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে। নাদিম সেই উত্তাল যৌবন পার করে আজ চল্লিশোর্ধ্ব পরিণত-মানুষ; যুদ্ধে যাওয়ার শক্তি ও উদ্দীপনা তার মধ্য থেকে অপসৃত। পঁচিশে মার্চে কালরাত্রির আচমকা ত্রাসে লীনা ত্রস্ত হলেও সময়ের আবর্তনে সে-ই ভেতরে ভেতরে যুদ্ধের প্রেরণা অনুভব করে উদ্দাম বয়ঃধর্মের কারণেই। নাদিম নিজে যুদ্ধে যাওয়ার উদ্দীপনা অনুভব না করলেও হায়েনাদের হাত থেকে বিপন্ন

দেশকে মুক্ত করার জন্য তারুণ্যদীপ্ত নবীনেরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে — সেটি গভীরভাবে প্রত্যাশা করেছে। ইঁদারার কাছে লীনার মধ্যে সামিনাকে কল্পনা করার ক্ষেত্রে নাদিমের এই মনস্তাত্ত্বিক ইশারাভাস লক্ষণীয়। এরপর পরিণত যৌবনে কবিতার সেতু ধরে নাদিমের জীবনে শাকিলার আবির্ভাব; আবার কবিতার কারণেই নাদিমের জীবন থেকে শাকিলার 'ইউটার্ন'। নাদিম এবার সত্যিই মননে-আবেগে মজেছিল শাকিলার প্রেমে; কিন্তু বৈশ্যশাসিত ভুবনের বাসিন্দা শাকিলার মনে প্রেমের চেয়েও আর্থিক নিরাপত্তা অনেক বেশি মূল্যবান। নাদিমের জীবন থেকে শাকিলার স্বেচ্ছা-অপসারণ সাময়িক বৈনাশিক উন্মাদনা সৃষ্টি করলেও পরিণামে নাদিমের মধ্যে জীবনময়তা ও কাব্যপ্রেম আরো ঘনীভূত হয়। শাকিলার শূন্যস্থান পূরণ করতে নাদিমের সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করে নাজমা। বৈশ্য হিসাব এখানে প্রথমে সক্রিয় হলেও কোন অদৃশ্য ও গূঢ় কারণে প্রেম না হলেও পারস্পরিক পছন্দের জয় হয়। নাজমাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পারিবারিক জীবনে পৈতৃক-উত্তরাধিকারচেতনা ও দায়িত্বশীল অভিভাবকত্ব নাদিমের চৈতন্যে সক্রিয় হয়। আর রুমানার সঙ্গে গড়ে ওঠা অসমবয়সী প্রেম শতদলে প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই নাদিম দাড়ি টানে চৈতন্যনিহিত পারিবারিক মূল্যবোধ বজায় রাখার টানে। পারিবারিক দায়িত্বসচেতন, পরিণত মনের হিসাবি মানুষের মনস্তত্ত্ব যুদ্ধে অংশগ্রহণের উপযোগী নয়। এছাড়াও মধ্যবিত্ত শ্রেণির একজন মানুষকে অস্তিত্ব-রক্ষার প্রয়োজনেই সব সময় কর্মস্থলের দিকে মুখ সন্নিবিষ্ট রাখতে হয়; কর্মস্থল থেকে মুখ ফেরালেই অস্তিত্বের ভিটেয় শুরু হয় টানাপড়েন ও সামূহিক বিপর্যয়। এই সকল হিসাব-নির্ভর জটিল মনস্তত্ত্ব নাদিমকে জনান্তিকে দাঁড় করেছে। এরপর ছা-পোষা মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরাভূত-মানস নাদিমকে গোপন-আবাস থেকে বের করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় ঢাকায়—অবরুদ্ধ, ক্ষত-বিক্ষত, বন্দি ঢাকায় ; তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় চাকরিতে প্রত্যাবর্তনের দাসখত। এক সুবোধ বালকের মতো মনের বিরুদ্ধ-চেতনায় নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে সে এক গভীর গ্লানিবোধে আচ্ছন্ন হয়। দেশ-বিরোধী এই ভূমিকা তার মনে লেপ্টে দেয় এক গাঢ় কালিমা; নিজের ভেতরের ভাঙচুর শেষে নিজেকে দেখতে পায় সে এক পচন-ধরা লাশ হিসেবে :

> অন্ধকারে সে পথ পাচ্ছে না। এমন অদ্ভুত অন্ধকার সে দেখেনি কখনো। সেই অদ্ভুত অন্ধকার ক্ষুধার্ত জন্তুর মত গিলে ফেলছে ওকে। কী আশ্চর্য, টুপিপরা শোকার্ত লোকগুলি নাদিম ইউসুফের লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর নাদিম বিস্ময়বিহ্বল চোখে দেখছে নিজের কাফন-মোড়া শরীর। একটা তীব্র দুর্গন্ধ এসে লাগে ওর নাকে, গোলাপ পানির ঘ্রাণেও চাপা পড়ছে না সেই উৎকট গন্ধ। (শামসুর, ২০০৭ : ১১৪)

যুদ্ধ এবং কবিতা দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী জীবন প্রপঞ্চ — 'ঈগল আর সাপের হিংস্র বিবাদে'র মতোই; এই বিবাদ অনন্ত, অবসানহীন। যুদ্ধ মানেই তো রক্তপাত, সভ্যতাবিধ্বংসী উন্মাদনা; মানবিক শুভবোধ এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অন্যায়ের প্রতিবাদে যুদ্ধ অনিবার্য হলেও একজন কবি বিপন্ন বোধ করেন যুদ্ধে। কবি কবিতার রঙমহলে অনিন্দ্য সুন্দরকে ফুটিয়ে তোলেন; কবিতার ছন্দবন্ধে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পে জীবনের সৌন্দর্য ও শুভময়তাকে রূপময় করেন সত্তার নির্যাস ঢেলে। একজন সৌন্দর্যধ্যানী, শান্তি বাদী কবি, যিনি অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে জীবন সৃজন করেন, তার পক্ষে অস্ত্রহাতে

জীবন-হনন তো অসম্ভব ব্যাপার। আত্মজীবনী *কালের ধুলোয় লেখা* গ্রন্থে শামসুর রাহমানের কবিসত্তার পরিচয় এখানে স্মরণীয় : 'আমার মনোভূমিতে যে বাগান রয়েছে, সেখানে সৌন্দর্য, কল্যাণ এবং প্রগতির সহাবস্থান বিদ্যমান, সেই বাগানের পরিচর্যার একটি প্রধান উপাদান হলো কবিতা। সেই মালঞ্চের মালাকার হয়ে বেঁচে থাকতে চাই।' (শামসুর, ২০০৫ : ২২৪) তাই বিধ্বস্ত ঢাকার রাজপথে যুদ্ধের উন্মাদনার সঙ্গে সম্পর্কহীন সালোয়ার-কামিজ-দোপাট্টা-পরা কলসি-কাঁখে রাস্তা-পেরুনো অবাঙালি মেয়ের স্বাধীন বাংলাদেশে করুণ পরিণতি কল্পনা করে নাদিমের সংবেদনশীল কবিআত্মা অস্বস্তি বোধ করে। অথবা, পাকিস্তানি সোলজার, যার হাত বাঙালির রক্তে রঞ্জিত, তাকেও যখন দেখে রাস্তার ফুটপাত থেকে বহুদূরে বসবাসকারী মেয়ের জন্য ছোট-কমদামি জামা কিনছে, তখন মোচড় দিয়ে ওঠে নাদিমের পিতৃ-হৃদয়। স্বাধীন বাংলাদেশে সেই হন্তারক সোলজার, যে উর্দির নিচে বহন করে স্নেহময় পিতার হৃদয়, তার জন্যও নাদিমের কোমল কবিহৃদয়ে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। কবির সংবেদনশীল কোমল হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধবাজ হন্তারকের কঠিন হৃদয়ের দ্বন্দ্বে নাদিম ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। উপন্যাসের পরিণামে বীভৎস সময়ে দেশের চরম দুর্দিনে দেশরক্ষার মহত্তম যুদ্ধে অংশ না নিয়ে বরং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিপরীত অক্ষে অবস্থান নেওয়ার ক্লৈবত্বজনিত হাহাকার উপন্যাসের পরিণতিকে ভারি করেছে; আবার আমরা লক্ষ করি, অন্যত্র, এই হাহাকার থেকে শত পাপড়ির সৌরভ ছড়িয়ে প্রস্ফুটিত হচ্ছে দেশপ্রেমের অনন্যসাধারণ কবিতামালা। এখানেই নাদিম ইউসুফের আদলে এক জনান্তিক কবির অন্তহীন মুক্তিযুদ্ধ অথবা নিজের সঙ্গে নিজেরই দ্বৈরথের কথকতা *অদ্ভুত আঁধার এক* উপন্যাস।

পাঁচ

কবিতা শামসুর রাহমানের প্রথম প্রেম; তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন তাঁর নিজের জীবনের সার্থকতা কবিতালিপ্ততার মধ্যেই নিহিত। তাই কবিতায় তাঁর স্পর্ধিত ঘোষণা : 'না বিত্তের ঝলসানি না রমণীর ভালোবাসা/শুধু এক শব্দতৃষা আমাকে অষ্টপ্রহর তাড়িয়ে বেড়ায়।' 'শব্দের শক্তিই কবির শক্তি — তাঁর ভূমিকার ভিত্তি।'(দ্র. ভূঁইয়া, ২০০৬ : ৪৯) রাহমান তাঁর কবিতায় শব্দের 'চোরা টানে' ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেন তাঁর বহুবর্ণিল কবিতা সদন। তিনি নিজের দ্রুত কমে যাওয়া সময়কে শাসন করেন 'শব্দের হিরণ্ময় চাবুকে', মৃত্যুর প্রতীক 'আগুন রঙের বাঘ' তাঁকে বলে : 'যতদিন তুই স্বপ্ন দেখে যাবি, চিত্রকল্প ছন্দের কম্পন/তোকে রাখে টান টান, যতদিন তোর শব্দপ্রেম/থাকবে অটুট;/যতদিন তোর বুকে মানবীর মানবের/ভালবাসা থাকবে, আমাকে ব্যর্থ ফিরে যেতে হবে।' কিন্তু শব্দ কখনো-কখনো কবিকল্পনাকে ফাঁকি দেয়, শব্দের সংকটে কবিসত্তায় ঘনিয়ে আসে দুঃসময় ও পতন। সৃষ্টিশক্তির অভাবে কবি বিপন্ন অনুভব করেন: 'শব্দের শ্মশানে দাঁড়িয়ে চিত্রকল্পের গোরস্থানে বসে/আমি কেবল ছাই ওড়াই, ছিঁড়ি ঘাস।' কবির এই অনুভবময়তা ও আত্মঘোষণার প্রতিফলন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে তাঁর কবিতাপ্রশ্রিত উপন্যাসে।

অক্টোপাস, উপন্যাসের প্রথাগত ব্যাকরণ না-মানা শাস্ত্রবিরোধী উপন্যাস; কবিতা-সমধর্মী হয়েও অনেকটা কবিতাপ্রশ্রিত উপন্যাস। এটি যে একজন বিশিষ্ট কবির রচিত বিশেষ উপন্যাস সেই পরিচয় এর সর্বাঙ্গে জড়ানো। প্রচুর সৃষ্টিতে বিশ্বাসী একজন শিল্পীর

সৃষ্টিমুখর হওয়ার গভীর আকুলতা আর এর বিপরীতে সৃষ্টিরিক্ত থাকার সীমাহীন যন্ত্রণা এবং পুনরায় সৃষ্টিসুখে উল্লসিত হওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা ও পরিণামে ব্যর্থতার করুণ নিনাদ —এ উপন্যাসের পটভূমি নির্মাণ করেছে। উপন্যাসের নায়ক ইশতিয়াক হোসেন নামজাদা লেখক, শিল্পমগ্ন, শিল্পের শুদ্ধতায় অবিচল, সৃষ্টির ঊর্মিমুখর প্রেরণায় নিরন্তর সঞ্চরণশীল এক কথাসাহিত্যিক। ক্ষুধার অন্ন আর নির্ঘুম সময়ের তিল তিল সাধনায় নিজেকে ভেঙেচুরে ক্ষইয়ে দিয়ে, চেতনাজগৎকে মথিত করে, সত্তার সমগ্র নির্যাস নিঙড়ে দিয়ে সে গড়ে তোলে শিল্পের মনোজ ভুবন। শিল্পের এই সাধনা তার দেহ-মনে শ্রান্তি-ক্লান্তি-অবসন্নতার কুয়াশা নামায় কখনো; কিন্তু সেই কুয়াশা মুহূর্তে কেটে যায় সৃষ্টি-সাফল্যের উষ্ণ স্পর্শে; এক প্রসন্নতা আর উপপ্লবী ভালোলাগার শিহরন আচ্ছন্ন করে তার সমগ্র সত্তা। শিল্পের সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে এক অমোঘ, অচ্ছেদ্য বন্ধনে; সেখান থেকে ছুটি নেই তার মুহূর্তের। চেতনার পঞ্চরেণু মেখে শিল্পের শুঁড় বিরামহীন উঁচিয়ে রাখে সে এক অনন্ত সৃষ্টির প্রেরণায়। রাশি রাশি অক্ষরে গড়ে তোলা হৃৎপ্রতিমার প্রেমে সে হয় সম্মোহিত; মগ্ন হয় মোহন কথোপকথনে। নিরন্তর সৃষ্টিপ্রেরণায় উজ্জীবিত ঔপন্যাসিক ইশতিয়াক জানে, পুরনো প্রতিমা বিস্মৃতিতে সমর্পিত হবে; আরো গভীর-গভীরতর প্রেরণায় লিপ্ত হবে সে নতুন কোন অক্ষর-দয়িতা সৃজনে। অবিরাম শিল্প-লগ্নতাই তার পরম কাঙ্ক্ষণীয়। শিল্পের রমণীয় আদরে সে থাকে সজীব ও উষ্ণ; লাভ করে এক পরম প্রশান্তি, মানসিক সুস্থিতি ও পরিতৃপ্তি। ক্ষণিকের শিল্প-খরাও তাকে অস্থির ও এলোমেলো করে দেয়, তার সত্তায় সঞ্চারিত হয় মৃত্যুর বিস্বাদ।

ইশতিয়াক গ্রিক ভাস্কর পিগম্যালিয়ানের মতো প্রাণহীন শব্দমালার বুননে সৃষ্টি করে অনন্ত সৌন্দর্যময়ী তিলোত্তমা-প্রতিমা এবং তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে মগ্ন হয় এক অবিনাশী প্রেমে। আপন সৃষ্টির প্রেমে মুখর হয়ে ওঠার মাধ্যমে ইশতিয়াক তার চেতনায় অনুভব করে শিল্প-সামর্থ্যের ঈশ্বরপ্রতিম অধিষ্ঠান। তিন বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় স্বরচিত 'অপচ্ছায়া' উপন্যাসের নায়িকা লোপাকে পূর্ণতা দেওয়ার মধ্য দিয়ে ইশতিয়াকের মনে মিশ্র অনুভূতি খেলা করে—'শেষ করতে পারার আনন্দ এবং শেষ হয়ে যাবার বিষাদ।' (শামসুর, ২০০৭ : ১১৬) ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের মতো উদ্ধৃতাংশটি ইশতিয়াকের নিঃশেষিত শিল্পী-সত্তার বিষাদকেই দীপিত করে। কারণ লোপাই তার সৃজনক্ষমতার সর্বশেষ স্মারক। এরপরই শুরু হয় সৃজনক্ষমতারহিত একজন শিল্পীর সৃজনমুখর হওয়ার সর্বতোমুখী চেষ্টা এবং গ্লানিময় ব্যর্থতায় সংরক্ত হওয়ার করুণ ইতিবৃত্ত। এক প্রবল বন্ধ্যাত্ব গ্রাস করেছে তার শিল্পী-চৈতন্যকে। ইশতিয়াকের মোহন কল্পনা আর স্বপ্নবিদ্ধ জীবন আজ বিধ্বস্ত, শিল্পীর মন আজ ঊষর বালুচর, সৃজনক্ষম প্রজ্ঞা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ইতঃপূর্বেও ইশতিয়াকের সৃষ্টিমুখরতায় সাময়িক ছেদ পড়েছে — সকল শক্তিমান শিল্পীর ক্ষেত্রেই যেমনটি ঘটে —আবার 'প্রাথমিক আড়ষ্টতার পর বরফ ফেটে উৎসারিত হয়েছে স্বচ্ছ ঝরনাধারা। আর আজ তার কলম অক্ষম, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। দু'তিন ঘণ্টা শ্রমের পর একটি বাক্যও তৈরি হয় না — এই অভিজ্ঞতা শক্তিশালী লেখক ইশতিয়াক হোসেনের পক্ষে খুবই নতুন। ভয় পায় সে, কুঁকড়ে যায় নিজের ভেতর।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৩৬) সারা দিনমান চাকরির ঘানি টেনে ক্লান্তি তে মূহ্যমান হয়েও সে লিখে গেছে অন্তহীন প্রেরণায়; 'অক্লান্ত লিখেছে পাতার পর পাতা।

কালো পিঁপড়ের সারি সাজিয়ে তুলেছে খাতার সাদা পাতায়।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৪৪) কিন্তু আজ 'সে জানে সারারাত হাতে কলম নিয়ে বসে থাকলেও, দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরলেও, কাগজে আঁচড়-মাচড় কিছুই পড়বে না। ইশতিয়াক এখন প্রেরণারহিত কবির মতো একটা মাটির ঢিবি যেন, পুরো একটা দেশলাইয়ের বাক্স ফুরিয়ে ফেললেও জ্বলবে না আতশবাজি।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৪৫) ক্লান্তি তাকে সৃষ্টিহীন করতে পারেনি; বরং সৃষ্টিহীনতা তাকে ক্লান্ত করে, ক্লান্তির বিষ ছড়িয়ে দেয় তার সমগ্র চেতনায়, ক্লান্তিতে ক্লান্তিতে খসে পড়ে তার মনের গ্রন্থিগুলো। এই সৃষ্টিরিক্ত জীবন তার কাছে আনন্দশূন্য ও দুর্বহ। ব্যর্থ লেখকের পক্ষাঘাত বহন করছে সে, ভাসছে এক বিপুল শূন্যতায় : 'নিজের ভেতরটা কেমন ফাঁকা আর ফাঁপা মনে হয়। ইশতিয়াকের মগজে শূন্যতা। শুধু কিছু বটের পাতার মতো মেঘের টুকরো মগজের ভেতরে ভেসে বেড়াচ্ছে।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৫১)

যে ভাবেই হোক ইশতিয়াক লিখতে চায়, লেখার জন্য সে ব্যাকুল ; তার লিখতে না-পারার কারণ উদ্ঘাটনে মরীয়া হয়ে সে সন্ধান-তৎপর। লেখার মত কিছু থাকলে লেখা আপনা থেকেই হয়ে যায় — এই ভাবনা-প্রপঞ্চ থেকে সে অভিজ্ঞতার সীমা বাড়াতে কখনো জনতার ভিড়ে এসে দাঁড়ায়, কখনো ফরাসি ঔপন্যাসিক মার্শেল প্রুস্তকে আদর্শ জ্ঞানে অন্যের মনোগহনের খবর নিতে উদ্গ্রীব হয়, আবার সৃজনীশক্তির অন্তঃসলিলা প্রেরণা — প্রথম যৌবনের দয়িতা শারমিনের স্মৃতিতর্পণে নিমগ্ন হয়। কিন্তু কোনো কিছুই তার খরাগ্রস্ত, ধু-ধু মরুভূমিতে ফসল ফলাতে পারে না। সে যে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত, তা তার কাছে মনে হয় অচিকিৎসেয়। তদুপরি সম্প্রতি সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি। ব্যস্ত নগরীর যত্রতত্র যখন-তখন এক অদ্ভুত প্রাণী তার দৃষ্টিসীমায় আবির্ভূত হয়। প্রথম দিকে প্রাণীটির ক্ষুদ্রতার কারণেই ইশতিয়াক তার পরিচয় শনাক্ত করতে না পারলেও ধীরে ধীরে সে সপরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ইশতিয়াক বুঝতে পারে, যে প্রাণীটি তার বেডরুমে, অফিসকক্ষে জনাব মোহাম্মদ তোশর্‌রফ আলী সাহেবের চেয়ারে, বাড়ির ছাদে, রাজপথে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, সে একটি জলজ প্রাণী এবং নাম তার অক্টোপাস। প্রাণীটি আপাত নিরীহ-দর্শন, কিন্তু স্বভাবে ভয়ঙ্কর হিংস্র। নিজের আটটি রবারের শক্ত টিউব দিয়ে অক্টোপাস যাকে একবার জড়িয়ে ধরে তার আর নিস্তার থাকে না। প্রাণীটির অস্তিত্ব প্রথম সে অনুভব করে স্বপ্নযাত্রায়; বিচ্ছিরি, ছোট, পিছল আর ঘেন্না-জাগানিয়া। পরবর্তীকালে যতবার প্রাণীটি ইশতিয়াকের চেতনায় জেগে উঠেছে, ততবারই তাকে পূর্বের চেয়ে বড়ো আর শক্তিশালী মনে হয়েছে। উপন্যাসের সমাপ্তি-ভূভাগে অক্টোপাসটি আবির্ভূত হয় বিশাল অবয়বে প্রবল-প্রমত্ত রূপে। অক্টোপাস নামক প্রাণীটির খবর কোন খবরের কাগজ ছাপে না, কেউ তাকে দেখে না; কেবল দেখে ইশতিয়াক — গ্রিক ত্রিকালজ্ঞ টাইরেসিয়াসের মতো। সে অনুভব করে, 'এই অক্টোপাসটি ওর নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে হামলা করে।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৬৪) ইশতিয়াক সচেতন সত্তায় জানে, অক্টোপাস সমুদ্রবিহারী প্রাণী, নগরের ব্যস্ত ডাঙায় এই ধরনের প্রাণীর কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তার যুক্তিনিষ্ঠ মন স্থলভাগে এই জলপ্রাণীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চেয়েছে, কিন্তু এ ভাবনা তার কাছে 'ভয়জাগানো অন্ধকারে শিস বাজানোর মতো।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৬৪) এই নিরস্তিত্ব প্রাণীটিই ইশতিয়াকের চেতনলোকে সবচেয়ে অস্তিত্বময়, অক্টোপাসের শুঁড়বন্দি সে

: 'মন থেকে সে ঝেড়ে ফেলতে চায় অক্টোপাসটিকে। কিন্তু পারে না। ইশতিয়াকের মনে পড়ে, ক্রমবর্ধমান এই জন্তুটি আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে সম্প্রতি। যেখানে সেখানে অতর্কিতে হামলা চালাচ্ছে—ধনীর ড্রইংরুমে, নির্ধনের খুপড়িতে, রেলওয়ে স্টেশনে, বাস টার্মিনালে, লঞ্চ ঘাটে, কাফে-রেস্তোরায়, এয়ারপোর্টে, বন্দরের জেটিতে। এই তো সেদিন, ইশতিয়াক দেখলো, অক্টোপাসটা নিউ মার্কেটে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব লণ্ড ভণ্ড করে দিলো। একদিন তছনছ করলো অধ্যাপক পাড়া। অথচ কেউ দেখতে পায় না এ তাণ্ডবলীলা। লোকচক্ষুর আড়ালে কেমন নির্বিবাদে অক্টোপাস এই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৮০) চৈতন্যে অষ্টভুজ অক্টোপাসের আনাগোনার খবর 'ভূতলবাসী রাজনৈতিক কর্মীর মতো' গোপন রাখে ইশতিয়াক : 'হয়তো সারাজীবন তাকে এ-কথা লুকিয়ে রাখতে হবে, যেমন ফোঁড়া লুকিয়ে রাখে রক্ত আর পুঁজ।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৫৮) ইশতিয়াক আরো অনুভব করে , তার জীবনে অবপ্রাণী এই অক্টোপাসের অস্তিত্বময়তাই তার শিল্পীসত্তাকে গ্রাস করেছে, প্রাণীটি বয়ে এনেছে ব্যর্থ লেখকের পক্ষাঘাত : 'হঠাৎ একটা চিন্তা মাছের মতো ঘাই মারে ইশতিয়াকের মনে। যখন থেকে সেই শুঁড়-অলা প্রাণীটা তার চোখে পড়েছে, তখন থেকেই কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সবকিছু।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৩৭)

জন্তুপ্রতিমার প্রচুর ব্যবহারে শামসুর রাহমানের কবিতা-সাম্রাজ্য যেমন মুখর তেমনি তাঁর উপন্যাসেও, বিশেষত *অক্টোপাস* উপন্যাসে জন্তু-প্রতিমার কাব্যিক পরিচর্যা শিল্পসাফল্যের চূড়াকে স্পর্শ করেছে। অবপ্রাণীর অসাধারণ ব্যবহারে পুরো উপন্যাসটিই প্রতীকের আবরণে মোড়ানো। উপন্যাসের গোড়াতেই ইশতিয়াকের মগ্নচেতনায় অসংলগ্ন দৃশ্য-পরম্পরায় বিচিত্র জন্তুসমেত যে জগৎ ধরা পড়ে তাতেই উপন্যাসের পরিণামী ব্যঞ্জনার সংকেত-সূত্র নিহিত এবং সমগ্র উপন্যাস ধরেই এ মগ্নচেতনা-ধৃত জীবনপট উন্মোচিত হতে থাকবে; এ যেন জ্যামিতির সম্পাদ্য-প্রকল্পনা, নানা সূত্রের পথরেখা পেরিয়ে সিদ্ধান্ত-প্রান্তে গিয়ে দেখা যাবে সেই প্রকল্পনা দু'বাহু বাড়িয়ে হাজির। ইশতিয়াকের মগ্নচেতনজগৎ অরণ্যময়, জটিল ও জান্তব। এই মনের অরণ্যে বাস করে দুই সত্তা — হরিণ ও বাঘ — সৌন্দর্যধ্যানী শিল্পীসত্তা ও বৈশ্যশাসিত বস্তুসত্তা। শিল্প ও বস্তু-বাস্তব ইশতিয়াকের অস্তিত্বের দুপ্রান্তে দুই রজ্জুর মতো ঝুলে থাকে। শিল্প আজ বস্তুবাস্তবের খোরাক। ইশতিয়াকের পক্ষপাতিত্ব শিল্পের দিকে, কিন্তু বস্তুসত্তার দাপটে তার শিল্পীসত্তা আজ অসাড়; সত্তানিহিত শিল্পকে রক্ষা করতে সে অক্ষম। স্বপ্ন-বাস্তবের বৃদ্ধ-রাজা অবক্ষয়িত সভ্যতার প্রতিনিধি, আর আপেলটি শিল্পের প্রতীক। অসুস্থ সভ্যতা সুস্থতা ও জীবনময়তা চায়, ক্ষয় থেকে মুক্তি চায়; বস্তুবাস্তবে এর চিকিৎসা নেই, চিকিৎসা আছে শিল্পে, ক্ষয়িত সভ্যতাকে বৈশ্য আগ্রাসনের প্রলয় থেকে বাঁচাতে পারে শিল্প; কিন্তু শিল্পই তো বস্তু-বাস্তবের বৈনাশিক আগ্রাসনের শিকার, শিল্পের সৌন্দর্যজগতে বস্তুসন্ত্রাসের প্রবল হানা। শিল্পের আপেল অপসৃত, তার জায়গা দখল করেছে শিল্পনাশী পিছল প্রাণী। বস্তু-কামনার আহ্বান নিয়ে ইশতিয়াকের জীবনে ইয়াসমিনের আবির্ভাব, কিন্তু তাতে ইশতিয়াকের আগ্রহ নেই। বাংলার শ্যামল-প্রান্তর আর বোদলেয়ার-এলান পোর শিল্পজগতের প্রেরণায় ইশতিয়াকের যে শিল্পীমানস গড়ে উঠেছে, তা-ই জলপ্রাণীরূপী বস্তুবাস্তবের থাবায় বিপর্যস্ত। বোদলেয়ার-

এলান পোকে গিলে ফেলার মধ্য দিয়ে বস্তু-সভ্যতার জীবন ও শিল্পবৈরী রূপটিই এখানে ফুটে উঠেছে। ইশতিয়াকের পিতা বস্তুবাস্তবের বৈশ্যমানুষ, গন্তব্য হাট, কেনেন মাছ— বস্তুকামনা যার শরীরে চকমক করে ওঠে। পিতা ইশতিয়াককে আহ্বান করেন নিজের পথে; কিন্তু কেনাকাটায় তার আগ্রহ নেই, তার আগ্রহ আদ্যিকালের বটতলায় বসা কয়েকজন মানুষের প্রতি, যাদের হাতে ছিলিম। আদ্যিকালের বটতলা আসলে চিরায়ত শিল্পের জগৎ, আর ছিলিম শিল্পে তন্ময়তা। শিশু ইশতিয়াক সেই 'ছিলিমেই' সবক নেয়। ছিলিমের চায়ের কাপে রূপান্তরণ আসলে ইশতিয়াকের বস্তুমুখিতাকেই দীপিত করে। স্বপ্নবাস্তবে শৈশব-কৈশোর-যৌবনের সময়সীমা গ্রন্থিত করে ইশতিয়াক সময়ের এক বিন্দুতে দাঁড়ায়। ইশতিয়াকের পঁয়ত্রিশ বছরের যে জীবনমণ্ডল গড়ে উঠেছে তাতে সে নিজেকে খুঁজে পায় একটি পোড়োবাড়িতে। এই পোড়োবাড়ি ইশতিয়াকের মগ্নচেতনায় বাস্তবতার ভিটা, যে নিজে ক্ষয়িত, তার ভেতরে আশ্রিত মানুষেরা রুগ্‌ণ, যার আগাছারা প্রবলভাবে জড়িয়ে বন্দি করে ইশতিয়াকের অন্তর্নিহিত শিল্পীচৈতন্যকে।

উপন্যাসের গোড়ার এই মগ্নচেতনার ছেঁড়া ছেঁড়া বক্তব্যই আরো সুস্পষ্ট অভিব্যঞ্জনা পেয়েছে উপন্যাসের মধ্যভাগে ইশতিয়াকের আরেক মগ্নচেতনচিত্রে। সেখানে স্বপ্ন-রেখায় দীপিত হয়ে উঠে ইশতিয়াকের শিল্পখরার অন্তর্নিহিত কারণ : 'জাহাজের ডেকে সন্ধ্যা নামে। সিঁদুর রঙের গোল সূর্য ডুবছে একটু একটু ক'রে। ইশতিয়াকের চুল উড়ছে হাওয়ায়। শারমিন বানু রেলিং ধ'রে দাঁড়ানো।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৪৬) শারমিনের কণ্ঠের মোহনীয় গানে রণিত রমণীয় সন্ধ্যা। তার স্বপ্ন-কল্পনায় শারমিনের জায়গায় এসে দাঁড়ান ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী সৃষ্টির অফুরান প্রেরণা 'বিজয়া', যাঁর কথা বলার ধরন ইয়াসমিনের মতো। সাহিত্যিক ইশতিয়াকের চেয়ে জ্বলজ্বলে ব্যবসায়ী আনিস কামালের সান্নিধ্য তার বেশি কাম্য। সাহিত্যিক ইশতিয়াকের প্রেম অপহৃত হয় বৈশ্য আনিসের কাছে। ইয়াসমিন ইশতিয়াকের কাছে বৈশ্যবিশ্বের প্রতিনিধি; ইশতিয়াকের শিল্পপ্রেরণাদাত্রী সৌন্দর্যময়ী শারমিনের পরিবর্তে সেখানে অধিষ্ঠিত হয়েছে বস্তুবাস্তবের প্রতিনিধি ইয়াসমিন। ইশতিয়াকের ভাবনাজগতে শিল্প আর বলয়কেন্দ্রে নেই, স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের ভালোমন্দ চিন্তাই এখন অগ্রাধিকার পায়। ফলে অন্তর্গত শিল্পরিক্ততার কারণেই তো আজ ইশতিয়াক সৃষ্টিশক্তিরহিত এক মৃতকল্প সাহিত্যিক; আজ যার লেখার ক্ষমতা নেই, যার কলম থেকে বের হয় না চিরায়ত কোন অক্ষর-প্রতিমা। ইয়াসমিন, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ও শারমিনের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নেই, ইশতিয়াকের চেতনলোকে আজ সবাই একই সমতলের বাসিন্দা। তাই মুঙ্কের বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর্ম 'চিৎকার'-এর ওপর ছবি-আঁকা অথবা বার্নার্ড শ-র আপেলের ওপর মূত্রত্যাগ করা — সব কিছুই শিল্পী কর্তৃক শিল্প-বৈরিতাকেই দ্যোতিত করে।

'শামসুর রাহমানের মনোবিশ্বের উজ্জ্বলতম খণ্ডের নাম প্রেম, যা তাঁর এক প্রধান কাব্যপ্রেরণা।' (হুমায়ুন, ১৯৯৬, ১৩৭) তিনি স্বীকার করেন তাঁর জীবনে 'নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতি' এবং তাঁর কবিতায় তাদের 'গাঢ় পদপাত' কিন্তু যোগ করেন তাদের অবয়ব অনেকটাই তাঁর 'মনের সৃষ্টি'। তবে তারা একজন আরেকজনের সঙ্গে মিশে যায় না। ভীরু প্রেম, নিঃশব্দ উচ্চারণ, সামান্য সুখ তাঁর প্রথম পর্যায়ের প্রেমের বৈশিষ্ট্য; দয়িতার দেহ তাঁর লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য দয়িতা-হৃদয় : 'তোমাকে যে ভালবাসি, তার/চিহ্ন তুমি কখনো পাবে না

খুঁজে প্রথাসিদ্ধ পথে।' ["একান্ত গোলাপ", *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*] ফলে, তাঁর কবিতায় ক্রমে শরীর কামনা জ্বলে উঠতে থাকে এবং তাঁর কামনালুব্ধ দৃষ্টিতে দয়িতা-দেহ পরিণত হয় এক সম্ভোগ-গহ্বরে। যেমন, *নিজ বাসভূমে* কাব্যগ্রন্থের 'ময়ূরগুলো' কবিতার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে দমিত কামনা-বাসনা, উপান্তে লক্ষ করা যায় কামনাস্ফূর্তি : ' হঠাৎ দেখি মুখ রেখেছি/গন্ধভরা রেশমি ঝোপে,/মত্ত আছি জমজ ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে/যুগল টিলা মুঠোয় কাঁপে/অন্ধকারে।'

অন্যদিকে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে, প্রথম যৌবনের প্লেটনিক প্রেমই ইশতিয়াকের শিল্পপ্রেরণার অনিঃশেষ উৎস। ওই প্রেম ও দয়িতাই বার বার ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে রক্ষা করেছে তার মনোবিশ্ব ও শিল্পীসত্তাকে। মন চেয়েছে, কিন্তু দেহ চায়নি বলে, মন ইশতিয়াককে সমর্পণ করে শারমিন তার ভোগতপ্ত শরীর নিয়ে ইশতিয়াকের জীবন থেকে অনেক দূরে, যেন দিগন্তের ওপারে আশ্রয় নিয়েছে। বস্তুবিশ্বের ভোগচেতনায় বিশ্বাসী শারমিন সযত্নে ভোগের কালিমা থেকে রক্ষা করেছে ইশতিয়াকের শানিত শিল্পীসত্তাকে। কিন্তু শারমিনের বিদায় তাকে নিক্ষিপ্ত করেছে এক সীমাহীন শূন্যতায়, এক অপরিমেয় বেদনায় : 'কেমন এক শূন্যতা সারা এয়ারপোর্টে। যেন কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই আশেপাশে।...দর্শনার্থীহীন এয়ারপোর্ট গোরস্থানের মতো বিষণ্ন আর ফাঁকা। কয়েক টুকরো কাগজ হাওয়ায় উড়ছে, যেন পুরনো স্মৃতি। জনমানবহীন এক প্রান্তরে একা দাঁড়িয়ে আছে ইশতিয়াক। এর আগে নিজেকে তার এমন একা আর কখনো লাগে নি। (শামসুর, ২০০৭ : ১২৬) ইশতিয়াকের ভালোবাসা অপরূপ তাৎপর্যে অভিব্যঞ্জিত হয়েছিল শারমিনের মধ্যে : 'ভালবাসা শব্দটির মধ্যে একটি হরিণ-খুশি আছে, ঝরণার ঝিরঝির ধ্বনি আছে, আরব্যরজনীর নায়িকার রেশমি নেকাবের রহস্যময়তা আছে, সুদূর কোন প্রাসাদের ঝালরের ঝিলিক আছে, ঝিলের স্নিগ্ধতা আছে, বনদোয়েলের মখমল-কোমল শিস আছে। আমি তাকে ভালবাসি; —এই উচ্চারণ আমাকে নিয়ে যায় দিলরুবা-মর্মরিত মরূদ্যানে, জ্যোৎস্নাপ্লুত অরণ্যে, সূর্যোদয়ে উদ্ভাসিত দূর দিগন্তের দিকে।' (শামসুর, ২০০৭ : ১২৮) শারমিনের প্রতি ইশতিয়াকের দেহাতীত প্লেটনিক ভালোবাসাই এক অনির্বাণ দীপশিখা হিসেবে তার শিল্পচেতনাকে জ্যোতির্ময় করেছে। বর্তমানে চিরায়ত অশরীরী প্রেমে আর ইশতিয়াকের আস্থা নেই, ভোগবাদী বস্তুবিশ্বের শিষ্যত্ব মেনে নিয়ে প্রেমকে সে করেছে শরীরনির্ভর : 'শারমিনকে সে ভালবাসতো দূর থেকে। তখন প্লেটনিক প্রেমের প্রতি ইশতিয়াকের অনড় আস্থা। দেহাতীত প্রেমই প্রকৃত প্রেম, সেকালে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিলো তার মনে। আর আজ? নিজের অজান্তেই সে হাসে। অবিশ্বাসীর হাসি। না, অমন নাইভ চিন্তা ইশতিয়াক ইদানিং করে না। কোনো অশরীরীকে মানুষ ভালবাসতে পারে না।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৪৫) কিন্তু শারমিনের মন নয়, শরীরের প্রতি ইশতিয়াকের চকচকে লোভ; সে মত্ত হয়ে হুইস্কি পান করে না, শারমিনের তরঙ্গিত যৌবন পান করে; প্রবল মত্ততায় ইয়াসমিনের শরীর ভোগ করে শারমিনকে কল্পনা করে : 'জোরে চেপে ধরে শারমিনের স্তন, নির্দয় স্পর্শে শারমিনের মধ্যে জেগে ওঠে কবেকার এক সুরসুন্দরী, কামকলায় যে পারদর্শিনী। দুটো শরীর মিশে যায় পরস্পর, মোহন যুগলবন্দী। 'ছাড়ো এবার, আর পারছি না। হলো এবার?' ইয়াসমিন হাঁপাতে হাঁপাতে বলে। ওর সমস্ত শরীর

শিশিরভেজা উদ্যানের মতো। ইয়াসমিন জানলো না এই মদির মধ্যরাতে কার প্রাপ্য কে পেলো।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৭২) ভোগের তাপে ইশতিয়াক শারমিনকে প্রেমের চিরায়ত স্বর্গ থেকে নামিয়ে আনল সাধারণ বস্তুভিটায়; অনির্বাণ প্রেরণা-শিখা আজ ভোগের কাদায় মাখামাখি। শারমিনের শরীর সন্নিধির জন্য ইশতিয়াকের মনে সক্রিয় এক 'অপ্রতিরোধ্য লোলুপতা। এই লোলুপতাকে সে বল্‌গা পরিয়ে রাখে। জটিলতা এড়ানোর জন্য।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৭৭) অপরদিকে ইশতিয়াকের সঙ্গে মিলনতৃষ্ণায় শারমিনও প্রতীক্ষারতা : 'যেমন জ্যোৎস্নাচমকিত ঝিলের ধারে উৎসুক হরিণী অপেক্ষা করে তার হরিণের জন্য।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৭৬) এই প্রেমরিক্ত শরীরী উন্মাদনা মানুষের মনে চিরকালের উষ্ণতা সঞ্চারে অক্ষম। এই জীবন পরিণামে গণিকা–পণ্যের মতো ব্যবহৃত হয়ে হয়ে এক সময় ম্রিয়মাণ হয়ে যায়, ভোগতপ্ত সত্তায় বয়ে আনে ক্লান্তির বিষাদ। অশরীরী দূরত্বের প্রেম সত্তায় ছড়ায় যে জ্যোতির্ময় দ্যুতি, শরীরের সীমায় সেই প্রেমের কী গ্লানিময় পরাভব — ইশতিয়াক-শারমিনে তা লক্ষ করা যায়। প্রেম ও শরীরে যেমন চিরায়ত মিলন-বিবাদ, শিল্প ও বস্তু অনুরূপ এক অনিঃশেষ মিলন-বৈরিতা নিয়ে মানব-অস্তিত্বে সতত ক্রিয়াশীল। শিল্পীকে বাস্তবের সীমানায়ই অবস্থান করতে হয়, কিন্তু বস্তু-বাস্তবে ডুবে নয়, বর্জন করে নয়, বস্তু-বাস্তব থেকে এক সম্ভ্রান্ত দূরত্ব রক্ষা করে; এই দূরত্ব শিল্পের জন্য প্রয়োজন। এই দূরত্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এক অসাধারণ উপমায় : 'পরমাণুর অন্তরে ইলেকট্রনরা যেমন অতি ক্ষুদ্র একটি অনন্ত-দূরতা রক্ষা করে — সেই রকম। আমি সবার মধ্যে একই আবর্তনের নিয়ম মেনে ঘুরছি, ফিরছি, কিন্তু সেই আদি, মৌলিক ব্যবধানকে যেন বিসর্জন দিতে না হয়।' (শামসুর, ২০০৭ : ১৬০)

ইশতিয়াক, অবশ্যই সাহিত্যিক ইশতিয়াক, শিল্পের এই মৌলিক প্রধাবনা সম্পর্কে সজাগ থেকে সৃষ্টি করে গেছে অসাধারণ সব শিল্পসফল উপন্যাস; কিন্তু পণ্য-বিশ্বের বৈনাশিক আগ্রাসনে ব্যক্তি ইশতিয়াকের অবচেতন মন আজ ভোগ-তপ্ত, বস্তু-লোভী; বস্তুর প্রাত্যহিক ঘষায় তার শিল্পীমন আজ ভোতা, ফলত নিষ্ফলা। বস্তু-গণিকার প্রেমহীন কামনা থরোথরো আহ্বান বিনাশী জেনেও অনুপেক্ষণীয়, এমনই তার উত্তাপ। বস্তু-বাস্তবে এই আত্মসমর্পণ একজন শিল্পীর জন্য এক গ্লানিকর পরাভব, মৃত্যুর সমান যন্ত্রণাদায়ক :

> আমি বরং জীবনকে গণিকার মতো ব্যবহার করে চলেছি। কিম্বা জীবনই আমাকে ব্যবহার করে যাচ্ছে এক ফালি ন্যাকড়ার মতো। মোট কথা, আমি ব্যবহৃত হচ্ছি। জীবন তার সমর্থ দাঁতে আমাকে চিবোচ্ছে মুরগির এক টুকরো মসৃণ হাড়ের মতো। চুষে নিচ্ছে ক্রমাগত। আমি নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিচ্ছি; কারণ না দিয়ে উপায় নেই। মধ্যে মধ্যে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা হয়, নড়ে উঠতে চায় প্রতিবাদলোলুপ চোয়াল। গর্তের মতো ঘরে আমার শরীর বিস্ফোরণ হতে চেয়ে শেষ পর্যন্ত একটা নমিত নদী হয়ে যায়। অল্পক্ষণ পরেই সান্ত্বনার দস্তানা মোড়া একটা অদৃশ্য হাত আমার কাঁধ স্পর্শ করে। আমি সেই হস্তধারীকে খুঁজে বেড়াই তন্ন তন্ন ক'রে। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। মনে হয়, অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত আমি কোনো অলৌকিক বাগানের দরজা খুলে-যাওয়ার মুহূর্তে এক অতল খাদে প'ড়ে কাতরাচ্ছি। (শামসুর, ২০০৭ : ১৬২)

সংসারের বন্ধনে জড়ানোর আগে ইশতিয়াক লাজুক ছিল সত্য, কিন্তু লাজুকতার অন্তরালে ছিল বুনো সৌন্দর্য, সত্তার গভীরে নিহিত একটি জেদি ও বিদ্রোহী ভাব, যা তাকে শিল্পী

করেছে। কিন্তু সংসার তার ধার কমিয়েছে, বানিয়েছে ছা-পোষা সাধারণ মানুষ। ইয়াসমিনকে নিয়ে তার চার বছরের দাম্পত্য জীবন। সংসারে কচি জনতা নেই, কচি জনতায় ইশতিয়াকের আগ্রহও নেই, বেসরকারি দফতরে মাঝারি ধরনের চাকরির বেতনে টেনেটুনে চলা সংসারে নতুন মুখের আবির্ভাব সমস্যা বাড়াবে, আর 'লেখালেখি যাবে নির্বাসনে, আপ্রাণ চেষ্টা করেও সংসারের ভেলাটিকে ভাসমান রাখা যাবে না। ভরাডুবি হবেই হবে।' (শামসুর, ২০০৭ : ১২৫) ইশতিয়াক পরিপার্শ্বের লাভালাভের হিসাব-নির্ভর বাস্তব থেকে দূরত্বের একটি বর্ম এঁটে তার শিল্পীসত্তাকে সংরক্ষণ করে। সে চাকরি করে তার শিল্পচর্চার দিকে মুখ রেখে। ভাবনার জগতে কল্পনার খেয়া বেয়ে ইশতিয়াক শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হয় তার নির্ধারিত গন্তব্য–শিল্পের সৃজনতীর্থে। কিন্তু ইশতিয়াকের চেতনজগৎ শিল্পের সৌন্দর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে বস্তু-বাস্তবের অভিমুখী হয়। অফিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে কখনো-কখনো তার মনে অনীহা জাগে, কিন্তু না গিয়ে উপায় নেই, চাকরি না করলে উপোস থাকতে হবে। তাই চাকরি যাওয়ার ভয়ে সে ত্রাস অনুভব করে, তার আকস্মিক মৃত্যুতে স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের দুর্দশা কল্পনা করে বিচলিত হয়। এই ধরনের বস্তু-বাস্তবিক ভাবনা তার শিল্পী-স্বভাববিরোধী, এক নিমগ্ন শিল্পীসত্তার আত্মিক পরাভব। শিল্পবিনাশী বস্তুবিশ্ব অক্টোপাসের রূপ নিয়ে ইশতিয়াকের চেতনজগৎকে গ্রাস করে। একটি অক্টোপাসকে সে সর্বত্র দেখতে পায়। এই অক্টোপাসের অস্তিত্ব বাইরের জগতে নেই, ইশতিয়াকের মগ্ন-অস্তিত্বের শেকড় থেকে এর জন্ম এবং সেখান থেকে পুষ্টি গ্রহণ করেই এর বৃদ্ধি। ইশতিয়াকের অস্তিত্বের শেকড়ে বস্তু-কামনার যে প্রণোদনা প্রোথিত, তা-ই এই উপন্যাসে ধরা দিয়েছে অক্টোপাসের আদলে। প্রাথমিক অসম্পূর্ণতা কাটিয়ে সে ইশতিয়াকের বস্তুবিশ্বে সংসক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বিবর্ধিত হয়। সীমাহীন ক্লান্তি, অতল নৈঃসঙ্গ্য আর সৌন্দর্য-রিক্ততা—এই বিষরাশির সর্বতাপী সংক্রমণে সমকাল ও পরিপার্শ্ব বিপন্ন; সমকালীন বাস্তব এক পরাবাস্তবে রূপান্তরিত। এক সর্বধ্বংসী, ভয়ঙ্কর অক্টোপাস তার অষ্টশুঁড় মেলে জাপটে ধরেছে সমকাল ও বস্তু-পৃথিবীকে; এর সর্বগ্রাসী ধ্বংসযজ্ঞ থেকে নিস্তার নেই কারোর। সময়ের বিনাশী প্রবর্তনায় শিল্প-সাহিত্য তার সহজাত মাধুর্য হারিয়ে বৈশ্য-শাসনের অধীনতা মেনেছে। সমকালীন আসুরিক বাস্তবতায় শিল্প আজ ধনবানের ড্রয়িং রুমের বাসিন্দা; বিত্তবানের জৌলুসের অংশ, ভোগের উপাচার, বিনোদনের সামগ্রী। শিল্পনিষ্ঠ সাহিত্যিকেরাও বস্তু-বিশ্বের প্রবল প্রতিনিধি জহির সিদ্দিকীর ঝলমলে পার্টির অংশ, যেখানে বস্তুবাদীরা ভোগের আসর বসিয়ে নিজেদের জৌলুস ঘোষণা করে। বস্তু-কামনার থরোথরো আহ্বান নিষ্ঠাবান শিল্পীরাও উপেক্ষা করতে পারে না। শিল্পের পূজারীরা আজ বস্তুবিশ্বের দাসত্ব করে; সুন্দর পরিপাটি সাজে ঝলমলে পার্টির সঙ্গে মানানসই হয়ে ইশতিয়াক সেখানে উপস্থিত হয়; আর ঝলমলে পার্টির দূতিয়ালি করে আরেক শিল্পী সৈয়দ নওশাদ করিম। ফলত, ইশতিয়াক, সৈয়দ নওশাদের মতো শক্তিশালী ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও ভর করেছে এক নিঃসীম খরা। তাদের অন্তর্নিহিত অবক্ষয়ের কারণেই, তাদের মন রুগ্‌ণ, ক্ষয়িত ও অবসিত।

অক্টোপাস উপন্যাসে একজন সাহিত্যিকের সতত সৃজনমুখর থাকার আকুলতা এবং বৈশ্য-শাসিত বস্তুমুখী চেতনার প্রভাবে প্রেরণাহীন নিষ্ক্রিয়তা সংকটকে ঘনীভূত করেছে;

এবং পরিণামে চাকচিক্যময়, ভোগমত্ত অথচ অন্তঃসারশূন্য সভ্যতার ক্ষয়ে আক্রান্ত একজন সাহিত্যিকের করুণ হাহাকার রণিত হয়েছে অবপ্রাণী অক্টোপাসের প্রতীকে।

ছয়

বিষয় ও বিষয়ীর তুলনামূলক বিবেচনায় *এলো সে অবেলায়* রাহমানের সরলীকৃত ও তরল উপন্যাসের পরিচয়বহ। এ উপন্যাসের বিষয় পরিণত বয়সের দুই নর-নারীর অমীমাংসিত প্রেম। দুজনই স্মৃতিসত্তায় বহন করে রক্তক্ষরণ-মথিত প্রেমের অভিজ্ঞান। পুরনো ক্ষতে আরামের প্রলেপ দিতেই তারা প্রেমে পড়ে, কিন্তু ফল ফলেছে উল্টো।

ডক্টর আখতার জামিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোড় অধ্যাপক এবং কনফারম্ড ব্যাচেলর —ছাপ্পান্ন বছরের প্রৌঢ়ত্বেও যেহেতু অকৃতদার। কোন নারীই ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি তার ব্রহ্মচর্যে, হৃদয়ের সকল আগল বন্ধ করে দিয়ে রক্ষা করেছেন তিনি তার নিজের কৌমার্য। প্রথম যৌবনের প্রেম ও প্রেমিকা রুখসানা তার স্মৃতিসত্তায় পেয়েছে প্রত্নপ্রতিমার অবিনশ্বরতা : 'জামিলের হৃদয়ের জ্যোৎস্নার ভেতরে একটি হরিণ শাবক গলা জড়িয়ে বসে আছে অর্ধস্ফুট শকুন্তলার মতো।' (শামসুর, ২০০৭ : ২০২) মামাতো বোন রুখসানার সঙ্গে প্রায় কথা বিনিময় হয়ইনি, নিজের অন্তস্থ অন্তর্বৃতি ও লাজুকতার কারণে তাদের মাঝে দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল মামার রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট। নিজের প্রেমকে প্রকাশ করার আকুলতা ছিল, কিন্তু প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। একদিন বৃষ্টিমুখর দুপুরে সেই সুযোগ এলো গভীর বেদনা আর অনন্ত রক্তক্ষরণ নিয়ে : 'বর্ষা মেদুর দুপুর। ...স্বর্গীয় ফলের মতো দুটি স্তন উন্মুখ হয়ে আছে ভেজা অন্ধকারে। এমন দৃশ্য এর আগে জামিল আর কখনো দেখেনি। ইম্প্রেশনিস্ট কোনো চিত্রকর যেন নিসর্গ ও নারীকে স্থাপন করেছেন পটে অবিস্মরণীয় যুগ্মতায়। কী-যে হলো জামিলের, মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে এগিয়ে গেল ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রের দিকে। তিমির-ঘন আকাশে ঝলসে ওঠে বিদ্যুল্লতা। প্রায় বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট জামিল ভেজা আবছায়ায় বিপুল আবেগে জড়িয়ে ধরে রুখসানাকে। কোনো বাধা পায় না সে।' (শামসুর, ২০০৭ : ২০৩) এর পরিণতিতে পিতৃ-মাতৃহীন, মামার ঘরে আশ্রিত জামিল তীব্র অপমানের পর নিজেকে খুঁজে পায় উন্মুক্ত প্রান্তরে — ঘরহীন বিশাল ঘরে। এরপর রিক্ত, নিঃস্ব কিন্তু অসাধারণ মেধাবী জামিলের শুরু হয় নির্জন আত্ম-প্রতিষ্ঠার লড়াই। শেষ প্রৌঢ়ত্বে দাঁড়িয়ে জামিল অনুভব করেন জীবনের সর্বরিক্ততা, নুসরাত আমানের সান্নিধ্যে বয়স-বিরুদ্ধ প্রগল্‌ভতায় মেতে ওঠেন তিনি। নুসরাত আমানও আনকোরা কুমারী নয়, শরীরসিক্ত প্রেমের অভিজ্ঞতা স্মৃতিসত্তায় বহন করে সে। হারুন তার জীবনে এসেছিল প্রবল-প্রমত্ত রূপে; আবার মৃত্যুর পরপারে আশ্রয় নিলে নুসরাত এক সীমাহীন নৈঃসঙ্গ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। সে সেই গভীর শূন্যতা ভরাট করতে চায় জামিলের সান্নিধ্যে এসে। কিন্তু বয়স এখানে বাধা। জামিলের চেতনায় তাদের প্রেমে বয়সের বাধাটি বড় হয়ে ওঠে : 'আমি প্রায় বুড়ো, ক্ষয়া, বিধ্বস্ত। আর তুমি তরুণী, সুন্দরীতমা।' (শামসুর, ২০০৭ : ২১৮) যৌনতা এখানে প্রবল প্রতিবন্ধক : 'বৃদ্ধ অধ্যাপক যখন ওর যৌন দাবি মেটাতে ব্যর্থ হবেন, তখন ভালবাসায় ভাটা পড়বে।' (শামসুর, ২০০৭ : ২২৬)

ফলত, এই অসম বয়সী প্রেম ব্যর্থ পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। এই উপন্যাসে শীতের সকালে বেড়ার ফাঁক গলে ঢোকা রৌদ্রকণার মতো মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধকালীন বীভৎসতা এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিরোধী শক্তির উত্থান, সমকালীন রাজনীতি এসব প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

সাত

কবি-ঔপন্যাসিক শামসুর রাহমান তাঁর উপন্যাসগুলোতে নায়ক চরিত্রের আড়ালে কবি শামসুর রাহমানের 'সেলফপোর্ট্রেট' রচনা করে আত্মদর্শন করেছেন অবিরাম। অদ্ভুত *আঁধার এক* উপন্যাসের নায়ক নাদিম ইউসুফ আসলে কবি শামসুর রাহমান নিজেই, তার পরিচয় নিহিত রয়েছে নিম্নোদ্ধৃত অংশে : 'নাদিম ইউসুফ কবি। সে এদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। তার পাঁচটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে।' (শামসুর, ২০০৭ : ৬৩) মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে শামসুর রাহমানের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ — *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* (১৯৬০); *রৌদ্র করোটিতে* (১৯৬৩); *বিধ্বস্ত নীলিমা* (১৯৬৬); *নিরালোকে দিব্যরথ* (১৯৬৮); এবং *নিজ বাসভূমে* (১৯৭০) প্রকাশ পেয়েছিল। 'আব্বার ইন্তেকালের পর চার বছরের মধ্যেই বাড়িটা বড় বেশি জখম হয়েছে।' (শামসুর, ২০০৭ : ৬২) শামসুর রাহমানের পিতৃবিয়োগ ঘটেছিল ১৯৬৭ সালের ২৮ এপ্রিলে মুক্তিযুদ্ধের চার বছর আগেই। এছাড়া, উপন্যাস-বিধৃত কোনো কোনো ঘটনার সঙ্গে কবি শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী *কালের ধুলোয় লেখা* গ্রন্থের নানা ঘটনা অবিকল মিলে যায়। উদাহরণ হিসেবে উভয় গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উপস্থাপন করা যেতে পারে :

১. (ক) আব্বা জীবিকা নির্বাহের জন্য ঢাকা শহরে বসবাস করতেন, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত আমাদের গ্রামের বাড়িতে, পাড়াতলীতে। গ্রামের পরিবেশে থাকতে পারলে তিনি মুক্তির স্বাদ পেতেন। (শামসুর, ২০০৫ : ৩৪)

(খ) আব্বা শহরে থেকেও পলাশতলীর সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে চেয়েছিলেন। পেরেছিলেনও। পলাশতলীতে জন্মেছিলেন তিনি। এখানেই তাঁর পূর্বপুরুষদের ভিটা, বাপদাদার কবর। (শামসুর, ২০০৭ : ৬২)

২. (ক) ইস্কাটনের দিলারা আমার বাল্যসখী হয়নি, হয়েছিল আমার খালাতো বোন হেনা। প্রায় সবসময় আমার সঙ্গে লেগে থাকত, খেলার আগ্রহ প্রকাশ করত। ওর সঙ্গে খেলতে ভাল লাগত, কিন্তু সারাক্ষণ আমার কাছাকাছি থাকুক, এটা আমি চাইতাম না। হেনা কখনও কখনও আমার সঙ্গে স্কুলে যাবার বায়না ধরত। বারণ করলেও শুনত না। একদিন সে চুপিসারে আমার পেছনে পেছনে অনেকটা পথ হেঁটে এল। ...ভারি রাগ হল হেনার উপর। ইচ্ছে হল, দিই এক চড় বসিয়ে ওর রাঙা ফুলো-ফুলো গালে। আরও ইচ্ছে হল ওর কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে বাড়ি নিয়ে যাই। ...বিড়বিড় করে কী যেন বললাম ওকে, বুঝিয়ে শুনিয়ে ওকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম। ... (শামসুর, ২০০৫ : ৪০-৪১)

(খ) খালাতো বোনের সঙ্গে প্রেম করার মধ্যে কোনো রোমাঞ্চ নেই, নাদিম এক সময়ে মনে করত। নাদিম, ওর নিজের ধারণা সামিনাকে কখনো ভালবাসেনি। ...নাদিম তখন ক্লাস সিক্স কিম্বা সেভেনের ছাত্র। তখন সামিনা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই নাদিমের সঙ্গে

কাটাত। এই অষ্টপ্রাহরিক ঘেঁষাঘেঁষি নাদিমের ভাল লাগত না। ...একবার সামিনা বায়না ধরল যে, সে নাদিমের সঙ্গে স্কুলে যাবে। নাদিম ওকে কিছুতেই স্কুলে নিয়ে যাবেনা।...নাদিম যখন বইখাতা নিয়ে স্কুলের পথে রওয়ানা হল, তখন সামিনা তার ধারেকাছে ছিলনা। সামিনাকে দেখে নাদিমের মেজাজ একেবারে খাট্টা। ঘুসি লাগাবে নাকি একটা। ... কী আর করে নাদিম, সামিনাকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হল। (শামসুর, ২০০৭ : ৭৬-৭৭)

৩. (ক) অসাম্প্রদায়িক হবার শিক্ষা পেয়েছি আব্বার কাছ থেকে। তিনি কখনও হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে আমাদের সামনে বড়ো করে তুলে ধরেননি। ...ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছিলেন। তাঁর বড়ো ভাই ফী পাঠাননি বলে আব্বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হন।... আমরা যাঁকে আমাদের গ্রামে কৈবর্তদের প্রাণরক্ষার জন্যে একা বন্দুক হাতে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দেখেছি, যাঁকে দেখেছি আমাদের প্রেসের হিন্দু ম্যানেজারকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অনেক ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে নিজের বাসায় আশ্রয় দিতে মাসের পর মাস, তাঁর জীবনচর্যাই আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেয়নি। (শামসুর, ২০০৫ : ২৯)

(খ) কী আশ্চর্য, এই মুহূর্তে ওর মনে পড়ল—বড় চাচার গাফিলতির জন্যে আব্বা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারেননি। বড় চাচা আব্বাকে পরীক্ষার ফিস পাঠাননি, কথাটা আব্বা গল্পচ্ছলে একদিন বলেছিলেন। (শামসুর, ২০০৭ : ৭৬)

জনাব তমিজ উদ্দীন চৌধুরীর কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন প্রশান্ত চৌধুরী। অনেক বছর আগে রায়টের সময় প্রশান্ত চৌধুরী নাদিমদের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন প্রায় এক মাস। তাকে নাদিমের আব্বা লুকিয়ে রেখেছিলেন গুণ্ডাদের খুনী দৃষ্টি থেকে। (শামসুর, ২০০৭ : ৭৯)

৪. (ক) আব্বার নির্দেশ ছিল তাঁর কবর যেন হয় আমাদের পারিবারিক গোরস্তানে তাঁর পিতার কবরের পাশে। বাবার ইচ্ছা পূরণের তাগিদে আমরা তাঁর লাশ চায়ের পাতা এবং বরফ দিয়ে সাজিয়ে একটি কফিনে রেখে রওয়ানা হলাম পাড়াতলী গ্রামের উদ্দেশে। ট্রেনে চেপে আমরা আব্বার লাশ নিয়ে পৌঁছলাম ভৈরব স্টেশনে মেঘলা বিকেলে। চতুর্দিকে হাওয়ার দুরন্ত মাতলামি।...আমরা দেরি না করে ঝড়ো আবহাওয়ায় আব্বার কফিন নিয়ে নৌকায় উঠে পড়লাম। তখন মানসিক অবস্থা এমন ছিল যে, প্রকৃতির বিরূপতাকে পাত্তা দেয়ার কোনও অবকাশই ছিল না। মেঘনার বুক চিরে হাওয়ার ঝাপটা সয়ে নৌকা চলছিল আলুঘাটার দিকে।...নদী সেদিন যে-রকম মারমুখী হয়ে উঠেছিল, অন্য কোনও দিন হলে আমি অন্তত মাঝিকে তীর ছেড়ে নৌকা চালাতে বলতাম না। ১৯৬৭ সালের ২৮ এপ্রিলের পড়তি বিকেলে তেমন চিন্তা মনের কোনও কোণেই ঠাঁই পায়নি। (শামসুর, ২০০৫ : ২১৭-২১৮)

(খ) ঢাকা থেকে মরহুম তমিজউদ্দীন চৌধুরীর ডেডবডি পলাশতলীতে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাঁর এরাদা অনুসারে।... মরহুম তমিজউদ্দীনের ডেডবডি নিয়ে শুরু হল ওদের ট্রেন যাত্রা। এপ্রিল মাস। ভ্যাপসা গরম। বেশি করে চায়ের পাতা দেয়া হয়েছে কফিনের ভেতরে। এবার মেথিকান্দায় না নেমে ভৈরবে নামল। আকাশে মেঘের জটলা। কালো মোষের চামড়ার মতো মেঘ। জোর হাওয়া বইছে। মাঝি নৌকা ছাড়তে রাজি নয়। অথচ নৌকা না ছাড়লে মুশকিল। বিকেল। একটু পরেই সন্ধ্যা। ...ফাহিম সাদেকের তদারকিতে ডেডবডি নৌকায় ওঠানো হল। আকাশে ঘন কালো মেঘ, মাঝে মাঝে বিদ্যুচ্চমক, কফিন, বুক ঠেলে-আসা কান্না; গলায় কী একটা দলা, ফোলা ফোলা লালচে চোখ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লাশরিকা — মাঝির বৈঠা, লগি, ছই, পানির

> ছলছলানি; মেঘনার ফোঁস-ফোঁসানি; ঝড়ের মুখে ঘাট ছেড়ে নৌকাযাত্রা — শোকার্ত মুহূর্তেও নাদিমের কাছে পুরো ব্যাপারটা একটা পরাবাস্তব কবিতার মতো মনে হয়েছিল। এরকম ঢেউ মেঘনার বুকে এর আগে আর কখনো দেখেনি কেউ। পাশাপাশি চলেছে দুটো নৌকা। উথালপাতাল ঢেউয়ের ওপর নৌকাযুগলকে দেশলাইয়ের খোলের মতো লাগছিল। (শামসুর, ২০০৭ : ৯৪-৯৫)

শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী *কালের ধুলোয় লেখা* গ্রন্থের (ছাপ্পান্ন পরিচ্ছেদ থেকে বাষট্টি পরিচ্ছেদের মধ্যে) সঙ্গে *অদ্ভুত আঁধার এক* উপন্যাসের সমান্তরাল পাঠে কবি শামসুর রাহমান এবং নাদিম ইউসুফের সমরূপতা সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। *কবিতা এক ধরনের আশ্রয়* গ্রন্থের ''কী করে 'বন্দী শিবির থেকে' লিখেছি'' প্রবন্ধে উপস্থাপিত মুক্তিযুদ্ধকালে রচিত *বন্দী শিবির থেকে* কাব্যের পটভূমি এবং *অদ্ভুত আঁধার এক* উপন্যাসের কাহিনি-পট অভিন্ন — গদ্যে ও কবিতায় ঘটেছে একই শিল্পীসত্তার উৎসারণ। ''কী করে 'বন্দী শিবির থেকে' লিখেছি'' প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যাক :

> ঢাকায় ফিরে কারো কারো পরামর্শে, বিশেষ করে আমার শ্বশুরের পীড়াপীড়িতে *দৈনিক পাকিস্তানে* যোগ দিতে বাধ্য হলাম। নিঃসন্দেহে এটা ছিল ভুল কাজ। কিন্তু কখনও কখনও মানুষ এমন পরিস্থিতি-বিড়ম্বিত, হতচকিত হয়ে পড়ে যে ভুল জায়গায় পা রেখে চলে। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আমি, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য প্রতীক্ষা-কাতর, অথচ খবরের কাগজে কর্মরত। এই বৈপরীত্য আমাকে পীড়িত করেছে; কিন্তু নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছি যে, মনে-প্রাণে আমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। দখলীকৃত দেশে সম্ভবত আমিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ে সর্বপ্রথম কবিতা লিখি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আমি কবিতা লিখে গিয়েছি একের পর এক। সে সব কবিতাই আমার *'বন্দী শিবির থেকে'* কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। (শামসুর, ২০০৫ : ৮১৫)

বন্দী শিবির থেকে কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহ কবি লিখেছেন ত্রাস-তাড়িত, মৃত্যু-শাসিত এক কৃষ্ণপক্ষে। ভীতির ছাপ তাই এ কাব্যগ্রন্থের সর্বত্রই লেপ্টে রয়েছে, এই সময়ের কবিতার স্বর নিম্ন, নরম ও কাতর। এই অন্ধকার সময়ে তিনি নিজেকে বন্দী বীর হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন ত্রাসের গুহায় আটকে পড়া কবিরূপে। বন্দী শিবিরে অবরুদ্ধ একজন সন্ত্রস্ত ও বেদনাতুর কবির যন্ত্রণাদগ্ধ অনুভূতিমালা স্বগত-আলাপের মতো উচ্চারিত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থের কবিতামালায়। বেয়নেটের মুখে বসে তিনি অন্তরঙ্গ স্বরে বারবার সম্বোধন করেন অধরা প্রিয়া স্বাধীনতাকে। ভীতি ও আশা — নয় মাস নরকবাসের সময়ে কবির এই দুই অনুভূতির স্পর্শে কাব্যটিতে ধরা পড়েছে একাত্তরের বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডের ওঠানামা।

কবিতা শামসুর রাহমানের কাছে আশ্রয়স্বরূপ। তিনি আজন্ম নিমগ্ন কবিতায়; যুদ্ধও তাঁকে কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। তিনি বিরুদ্ধ-পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে তাঁর কবি-মনোজমিটিকে রক্ষা করেছেন নিরন্তর; সৃষ্টিমুখর থেকেছেন আমৃত্যু; কবিতা রচনায় সাময়িক বিরতিও তাঁকে বিচলিত করেছে। কবিতার প্রয়োজনেই তিনি তাঁর কবিতার বাঁক বদল ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শামসুর রাহমানের আত্মমূল্যায়ন গুরুত্ববহ : 'কাব্যক্ষেত্রে পদার্পণের পর কিছুকাল কবিতার ত্রিসীমায় দরিদ্র সাধারণজনের কোনও

সমস্যা, বাস্তবের ছায়াকে ঘেঁষতে দিইনি। কিন্তু কিছুকাল পর সমাজের অস্থিরতা, নানা সমস্যা আমার কবি-সত্তার ঘাড় ধরে বাস্তবতার মুখোমুখি নিয়ে এলো। বুঝতে আমার বাকি রইলো না যে, শুধু কল্পনার মায়াজালে আটকে থাকলে চলবে না, কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের কাছেও হাত পাততে হবে কবিতার সারবত্তা অর্জনের জন্য।' (শামসুর, ২০০৫ : ২২৪) এর সম্পূরক তথ্য অন্যত্র লভ্য : 'সমাজের অনাচার, অবিচার, শাসকের অপশাসন এবং বেয়াড়া লুণ্ঠনের কথা তো আকারে ইঙ্গিতে হলেও প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখি। সেটুকু কাজ·করার জন্যে লেখনীকে ব্যবহার তো করতেই পারি। তবে সেসব কথা লিখতে গিয়ে প্রপাগান্ডার কাঁধে সওয়ার হইনি সিন্দাবাদের নাছোড় বুড়োর মতো। কবিতাকে যথাসাধ্য কবিতাই রাখতে চেয়েছি।' (শামসুর, ২০০৫ : ২২৬) জীবিকার জন্য তিনি সাংবাদিকতা পেশাকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন; বাস্তবের ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও তাঁর কবিসত্তাকেই অনশ্বর করেছেন। কবিসত্তা রক্ষায় অবিচল এক সংগ্রামী শিল্পী হিসেবে শামসুর রাহমানের পরিচয় যেমন তাঁর কবিতায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তেমনি উপন্যাসগুলোর প্রতিটি চরিত্রে — *অক্টোপাস* উপন্যাসের নায়ক ইশতিয়াক হোসেন, *অদ্ভুত আঁধার এক* উপন্যাসের নায়ক নাদিম ইউসুফ ও *নিয়ত মন্তাজ* উপন্যাসের নায়ক নাসিম তারেক-এর —সংরক্ত জীবন-পরিক্রমার মধ্যে অবিরাম সৃষ্টিমুখর ও কবিতানিমগ্ন শামসুর রাহমানের প্রতিকৃতি বিম্বিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, কবিতার শব্দসংকেতে, ইমেজের অবয়বে যেখানে কবি শামসুর রাহমানের আত্মপ্রতিকৃতি বিম্বিত হয়েছে মন্ময়তায়, সেখানে উপন্যাসের পলিমাটিতে অভিন্ন রাহমানকেই আমরা ফলে উঠতে দেখি তন্ময়রূপে। কবিতায় শামসুর রাহমান ধরা দেন কল্পনা ও আত্মদ্রষ্টার ভূমিকায়, আর উপন্যাসের শামসুর রাহমান হয়ে ওঠেন পলিমাটির সোঁদা গন্ধ গায়ে মেখে বাস্তব জীবনঘনিষ্ঠ। হয়ত, কবিতার বাস্তবতা আর উপন্যাসের বাস্তবতার ফারাকটুকুই তাঁর কবিতা আর উপন্যাসের বাস্তবতার মধ্যে একটি অদৃশ্য অথচ বাস্তব সীমারেখা টেনে দিয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

অশ্রুকুমার সিকদার, ১৯৯৩। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, ১৯৯৩। *করতলে মহাদেশ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।

খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ১৯৯৪। *বাংলাদেশের কবিতা অন্তরঙ্গ অবলোকন*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০২। *চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব*, দ্বিতীয় প্রকাশ : র‍্যাডিক্যাল সংস্করণ, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল, ২০১৩। *কবির চেতনা চেতনার কথকতা*, প্রথম প্রকাশ, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

বেগম আকতার কামাল, ২০০৭। *কবির উপন্যাস*, ঐতিহ্য, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৯। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, প্রথম আজকাল সংস্করণ, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী, ২০১০। *নিয়তির পক্ষ-বিপক্ষ ও বিবিধ প্রবন্ধ*, প্রথম প্রকাশ, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পাদক), ২০০৬। *নির্জনতা থেকে জনারণ্যে শামসুর রাহমান*, প্রথম প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান, ১৯৯৭। *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

শামসুর রাহমান, ২০০৭। *শামসুর রাহমানের উপন্যাস সমগ্র*, প্রথম মুদ্রণ, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা।

শামসুর রাহমান, ২০০৫। *গদ্য সংগ্রহ*, সম্পাদক : গৌতম রায়, প্রথম প্রকাশ, পুনশ্চ, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, তৃতীয় সংস্করণ, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা।

সুধীর চক্রবর্তী (সম্পাদক), ২০০৫। *বুদ্ধিজীবীর নোটবই*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯৬। *শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।